Indian Science News Association
ESTD.–1935

বিজ্ঞান কথন

কলকাতা/ নভেম্বর ১০, ২০২২, বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

বি V P প্র

এ জনতরঙ্গ রোধিবে কে ?

সংবাদটি চমকে ওঠার মতই। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গত বছরে সারা দেশে অত্যাচারের হার কমেছে প্রায় ৮%! সুখের কথা। অথচ একই সময়ে বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের ওপর অত্যাচারের হার বেড়েছে প্রতি লক্ষে ১০১.৭ শতাংশ। এবং তাও রাজধানী দিল্লিতে।

এই কি দেশের অগ্রগতির নমুনা? এই কি সেই কোন কালে শোনা geriatrics বা gerentology বা সাদা বাংলায় বার্ধক্য বিজ্ঞানে গবেষণার পরিণতি? আজ বহুল প্রচারিত রবিবারের সাময়িকীতে জোড়া পাতায় বৃদ্ধাশ্রমের বিজ্ঞাপন। টেলি-ভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে প্রায়ই দেখা যায় সম্পত্তির লোভে বৃদ্ধ বাবা মা সন্তান কর্তৃক সংসার থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এ কোন দেশে তাহলে আমাদের বাস?

ব্যতিক্রম কি নেই? ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এমন সন্তানের খোঁজ আজও মেলে যারা বৃদ্ধ বাবা-মার রক্ষা কল্পে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দার পরিগ্রহ করেননি। সেটিই অবশ্য শেষ কথা নয়। অথচ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই আজ দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার অন্তত ১০.১ শতাংশই ষাটোর্ধ। একটি অসরকারি সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী ১৯৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যাটি দ্বিগুণ হয়ে যাবে যদি জনসংখ্যা এই হারে বৃদ্ধি হতে থাকে। এমনিতেই আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে যে আমাদের দেশের জনসংখ্যা চিনের জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে যাবে ১৯৩০ সালের মধ্যেই? তাহলে?

সন্দেহ নেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। আবিষ্কার হয়েছে অনেক নতুন ওষুধপত্রের, অ্যান্টিবায়োটিকের। জীবন-যাত্রার মানও বেড়েছে। উন্নত হয়েছে চিকিৎসা পদ্ধতিরও। শরৎচন্দ্রের ভাষায় গ্রাম কে গ্রাম ওলাউঠা বা প্লেগে উজাড় হওয়ার কথা আজ আর শোনা যায় না। সেই পরিসংখ্যানেই বলা হয়েছে গড়ে পুরুষের জীবন কাল বেড়ে হয়েছে এখন ৬৮! মহিলাদের ক্ষেত্রে যা ৭০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

প্রশ্নটা সেখানেই। বিজ্ঞানের উন্নতির এই ফসলের লাভ করতে পারছেন কতজন? দেশে বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য একটি সামাজিক মন্ত্রক আছে। আছে এ সম্পর্কে একটি জাতীয় নীতিও। কিন্তু তার সফল রূপায়ন কি হয়েছে? এ রাজ্যেও তো বার্ধক্য ভাতার কথা শোনা যায়। আনুগত্য না দেখালে সেই সামান্য ভাতা কতজনের কাছে পৌঁছয়?

একটি প্রচলিত প্রবাদের কথা আমরা প্রায়ই শুনি: the other side of the fence is always green. গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও এই প্রবাদের রূপায়ন তাঁর নিজের ছন্দে প্রকাশ করেছেন। সে কথা থাক। আমরা এমনিতেই পাশ্চাত্যের মোহ আবরনে আবিষ্ট হয়ে থাকি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মনে করি the eternal land of milk and honey. সেই মহাদেশের অনেক কিছুই কালিমা লিপ্ত হওয়া সত্বেও আমরা তাদের অন্ধকার দিকগুলিই অন্ধভাবে অনুকরণ করার চেষ্টা করি। অথচ এ খবর রাখিনা যে ঐ দেশে একটি শক্তপোক্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যাবস্থা আছে, বিশেষ করে প্রবীণদের জন্য। মূল্য বৃদ্ধি, চিকিৎসা ব্যয় প্রভৃতির কথা চিন্তা করে সে দেশের সরকার বৃদ্ধদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে খরচ ৮.৭ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। আগামী জানুয়ারি থেকেই বয়স্কদের মাসিক পেনশন ১,৮২৭ ডলার দাঁড়াবে বলে একটি আন্ত র্জাতিক সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় সেই অঙ্ক কত? সে হিসেব বোধ হয় না করাই ভালো।

এমনিতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাম্প্রতিক Human Development Report এ ভারত ১৫৮টি দেশের মধ্যে ১৩০তম স্থানে রয়েছে। দেশে পেনশন প্রাপক প্রবীণদের সংখ্যা মাত্র ১৭.৪ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতি ঘটেই চলেছে। ব্যয়বৃদ্ধিও অব্যাহত। তার আঁচ বৃদ্ধদের গায়েই বেশি লাগছে। সরকার জোর দিচ্ছে Digital India র ওপরে অথচ বৃদ্ধরাই আজ cyber crime এর সবথেকে বড় শিকার। অন্যদিকে সংবাদে প্রকাশ, বিজ্ঞানে গবেষণায় অনুদান কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাহলে আর বার্ধক্য বিজ্ঞানে নতুন কাজ হবে কি করে? এ অবস্থায় বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা কি আজ সমাজে শুধু করুণা, অনুকম্পার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকবেন?

এ প্রশ্ন উঠত না যদি না রবীন্দ্রনাথের এই কথা আমরা শুনতাম: মানুষের জীবনে যদি টাকা পয়সা অপ্রয়োজনীয় হত তাহলে সর্বত্রই ভালবাসা বিরাজমান থাকত। কে আর এভাবে বলবেন?

boseprasanta@hotmail.com
arnab_jour@yahoo.co.in

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান দিবস

কিছু কথা ১

দেবপ্রসন্ন সিংহ

বহু দশক ধরে আমরা নানা দিবস পালন করছি। সারা বছর সেই সব দিবস পালনের কথা মনে রেখে বহু অনুষ্ঠান দেশে বিদেশে করা হয়। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান দিবস বা জাতীয় বিজ্ঞান দিবস তার ব্যতিক্রম নয়। এই দুই দিবসেই প্রতি বছর বিশেষ একটি আলোচ্য বিষয়ে জোর দেওয়া হয়, সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াও যাতে সমাজে বিজ্ঞানের মূল ভাবনা, আবিষ্কার, ব্যবহার-গুলি ফিরে দেখা যায়, আর ভবিষ্যতের বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উদ্ভাবনকে উন্নয়নে রূপ দেওয়া যায়। শান্তি ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান দিবস শুরু হয়েছে এই শতাব্দী থেকেই। প্রথম দিবসটি পালিত হয় ১০ নভেম্বর, ২০০২ সালে। এই বছর একই দিনে এবারের আলোচ্য বিষয় 'স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য মৌলিক বিজ্ঞান'। গত বছরের বিষয় ছিল 'জলবায়ু-প্রস্তুত সম্প্রদায়'।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ছোটবড় সব মানুষদের শামিল করে বিজ্ঞানের সুফল তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী ভাবে পেলেও মানুষ তার বিভিন্ন চাহিদায় নিজেই পরিবেশ ভাঙে উন্নয়নের জন্য, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাকে মদত যোগায়। আবার বিজ্ঞানের অন্য হাতিয়ার এসে শান্তির সহাবস্থানে থাকার জন্য উন্নয়নকে বিকল্প পথে নিয়ে যেতে চায়। সে ধারা প্রবর্তনে সময় যায়, ছোটবড় যুদ্ধ বিতর্ক এসে পড়ে।

>>৪

কিছু কথা ২

সেখ জিন্নাত আলি

বিশ্ব বিজ্ঞান দিবসের মুল কথা শান্তি এবং উন্নয়ন। মানব জীবন ও বিজ্ঞানের মধ্যে যোগাযোগ নিবিড়। মানুষের বেশির ভাগ কাজ বিজ্ঞান নির্ভর। আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ও তার সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা সফলতার পথে আজও অন্তরায় হচ্ছে।

শুধু তাই নয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন, বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ সহ বহুবিধ বিষয়ে আমাদের আগাম সতর্ক করে বিজ্ঞানের গবেষণা। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক নির্ভরতা সত্বেও বিজ্ঞানের প্রতি অবহেলার আজ বাড় বাড়ন্ত। বলা যায় সচেতন মানুষের তুলনায় বিজ্ঞানের প্রতি অজ্ঞতা প্রকাশ করার মানুষ আজ অনেক বেশি।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UN-ESCO), বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০১ সালে বিশ্ব বিজ্ঞান দিবসের ঘোষণা করে। বিভিন্ন দেশের সরকার, বেসরকারি সংস্থা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার সংগঠন, সংস্থা, সমিতি ও সংবাদ মাধ্যম একত্রিত ভাবে এই দিনটি পালন করে আসছে। আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের কথাও এখানে উল্লেখ্য। 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যোগাযোগ আয়োগ' (NCSTC), ১৯৮৬ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত ভারত সরকারের কাছে আবেদন করে।

>>৪

ফসি ও আমরা

প্রশান্ত কুমার বসু:

আমাদের তো সিধু জ্যাঠা নেই। অগত্যা গুগলজ্যাঠারই শরণাপন্ন হতে হল। উনি আবার ওঁকে বলেন ফৌসি। কেউ বা বলেন ফসি, আবার কেউ বা ওঁকে ডাকেন ফচি বলে।

শেক্সপিয়ার অবশ্য বলেছেন নামে কি এসে যায়? সত্যিইতো ডা. অ্যান্টনি ফসির কিইবা এসে যায়? আমি অবশ্য ওঁকে সরাসরি দেখিনি। দেখিনি বললে ভুল হবে। করোনাকালে আমরা অবশ্যই ওঁকে সবাই দেখেছি। কাগজে, টিভিতে, ম্যাগাজিনে, কোথায় নয়? কারণ, বিশ্ববিশ্রুত মার্কিনি এই মহামারি বিশেষজ্ঞ কোভিড নিয়ে যা বলেছেন সারা দুনিয়া তাই শুনতে বাধ্য হয়েছে। কখনও লকডাউন, কখনও মাস্ক, বা কখনও বুস্টার ডোজ। লোকের করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে ভুল ধারণা ভাঙতে, টোটকা টোটকির খপ্পর থেকে বাঁচাতে ওঁর দৃপ্ত বক্তব্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে হাজার কষ্ট সত্যেও এই অতিমারির ভয়াবহতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। তা এই রকম একজন লোকের নাগাল আমি কি করে পাই যে ওঁর সাক্ষাৎকার নেব? অবশ্য তার আর প্রয়োজন পড়বে না। কারণ, গত ২২শে আগষ্ট বোমাটা উনিই ফাটিয়েছেন। উনি এবার নেমে দাঁড়াবেন। এবং সেটা অচিরে, এই ডিসেম্বরেই। রেগ্যান থেকে শুরু করে বাইডেন পর্যন্ত সাত, সাতটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা থাকতে থাকতে উনি কি ক্লান্ত? উনি কি ক্লান্ত হতে পারেন, ক্লান্ত থাকতে জানেন? আশির ঘরে পৌঁছে ফসি জবাবটা দিয়েছেন নিজেই। "আমি এবার জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ করতে চাই"!

শুধু মার্কিনি কেন সারা দুনিয়ার মিডিয়ার ধন্দ অবশ্য তাতে কাটেনি। কি করবেন উনি? আবার বই লিখবেন? সবাই নিঃসন্দেহ সেটা বেষ্ট সেলার হবেই। "এই ৮২ বছর বয়সীর বই ছাপবে কে? তাছাড়া আমার পক্ষে

>>২

নোবেল পাবেন পাবো

অমিত কৃষ্ণ দে:

আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমাদের আগে যারা এসেছিল তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ২০২২ সালের শারীরবৃত্তবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কারটি পেয়েছেন একজন সুইডিশ জিনতত্ত্ববিদ, যিনি আমাদের বিলুপ্ত প্রজাতি মানুষের ডিএনএ থেকে আধুনিক মানুষের বিবর্তন খুঁজে পেয়েছেন। ড. সান্তে পাবো (Svante Paabo) , জার্মানির লাইপজিগে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর ইভোলুশনারি অ্যানথ্রোপলজির একজন পরিচালক এবং প্যালিওজেনোমিক্স ক্ষেত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

পাবো আমাদের নিকটতম বিলুপ্ত দুটি প্রজাতি মানুষের মধ্যে নিয়ান্ডারথাল ও ডেনিসোভান এর জিনোমকে ক্রমানুসারে তৈরি করে দেখেছেন যে প্রায় ৭০,০০০ বছর আগে আধুনিক মানুষ আফ্রিকা থেকে চলে যাওয়ার পরেও তাদের ডিএনএ আমাদের সাথে মিশেছে।

নিয়ান্ডারথাল হাড়গুলি প্রথম ১৮৫৬ সালে নিয়ান্ডার ভ্যালিতে একটি জার্মান খনিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু জেনেটিক বিশ্লেষণ ও ডিএনএ সিকোয়েন্সিং করেও বিজ্ঞানীরা সঠিক তথ্য যোগাড় করতে সক্ষম হননি। সম্প্রতি ২০০৮ সালে, সাইবেরিয়ার ডেনিসোভা গুহায় আবিষ্কৃত ৪০,০০০ বছরের পুরানো হাড়ের খণ্ডের জিনোমের মধ্যে উঁকি দেওয়ার পরে পাবো এবং তার সহযোগী গবেষকরা একটি সম্পূর্ণ নতুন হোমিনিন আবিষ্কার করেছিলেন - ডেনিসোভান।

আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের এই শাখাটি পূর্ব ইউরেশিয়ায় মানুষের সাথে মিলিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর অর্থ হল মেলানেশিয়া, ওশেনিয়ার একটি উপ-অঞ্চল যার মধ্যে নিউ গিনি, সলোমেন দ্বীপপুঞ্জ, ভানুয়াতু, নিউ ক্যালেডোনিয়া এবং ফিজি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশ রয়েছে।

তাও নিয়ান্ডারথালরা তাদের বড় মস্তিষ্ক নিয়ে অত্যন্ত সামাজিক এবং জটিল সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করেছিল। বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় ৪০,০০০ বছর আগে তাদের অবলুপ্তি পর্যন্ত তাদের সাংস্কৃতিক ধরনধারণ খুব কমই পরিবর্তিত হয়েছিল। ডেনিসোভান থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জিনের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল আধুনিক তিব্বতিদের উঁচু পাহাড়ে কম অক্সিজেনে বেঁচে থাকা।

পাবোর আবিষ্কারগুলি কেবল মানুষ কোথা থেকে এসেছে তা প্রকাশ করতেই সাহায্য করছে না, হোমো সেপিয়েন্স কীভাবে এত সফল হয়েছিল এবং কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার আরও তথ্য খুজে বার করার জন্য আমাদের অপেক্ষায় রেখেছে।

উপদেষ্টা
ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস
অ্যাসোসিয়েশন
(ডিএস টি, গভ. অব ইন্ডিয়া)
ade59247@gmail.com

এই মাসই আচার্যের জন্মমাস

নতুন আলোয় জগদীশ চন্দ্র বসু

অনির্বাণ দে:

নভেম্বর মাসটি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু-র জীবনেতিহাসের খাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রাণপ্রিয় বন্ধু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের আড়াই বছর আগে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখে বিক্রমপুর পরগনায় (বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলা) আবির্ভূত এই বিজ্ঞান-সাধক গিরিডি শহরে তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন নিজের জন্মদিনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর। আসুন, সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আচার্য বসু সম্বন্ধে কিছু অজানা ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জেনে নিই আমরা:

* আচার্য বসু আজীবন নিজের ইংরেজি বানান লিখেছেন 'Jagadis Chunder Bose' (Jagadish কিংবা Jagdish তো নয়ই, Chandra-ও নয়)। তাঁর সমস্ত ইংরেজি গবেষণাপত্র, কৃতিস্বত্ব (patents) ও চিঠিপত্রই এর প্রমাণ বহন করে।

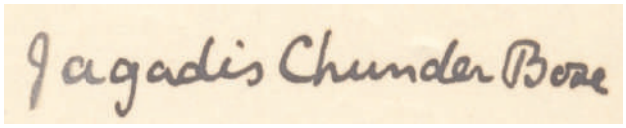

* ব্রাহ্ম হওয়ার সুবাদে জগদীশবাবুর পরিবারের সঙ্গে রায়(চৌধুরী) পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। অনেকেই মনে করেন যে, এই নিরহংকার, আত্মপ্রচার-বিমুখ ও ঋষিতুল্য বিজ্ঞানসাধকের আদলেই সত্যজিৎ রায় প্রোফেসর শঙ্কুকে গড়ে তুলেছিলেন। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, বসু ও শঙ্কু দুজনেই নিজের উদ্ভাবিত অসংখ্য সরল অথচ গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের কৃতিস্বত্ব নেওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, দুজনেরই বাসস্থান ছিল বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গিরিডি!

* ১৮৯৪ সালের নভেম্বর মাসে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের দুটি ঘরের মধ্যে জনসমক্ষে সর্বপ্রথম মিলিমিটার পাল্লার বেতারতরঙ্গের উৎপাদন, প্রেরণ ও গ্রহণের পরীক্ষামূলক প্রদর্শন করে দেখান। বর্তমানে 'মিলিমিটার-তরঙ্গ (millimetre waves)'কথাটি অপ্রচলিত হলেও এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য আধুনিক পরিভাষায় অণুতরঙ্গ (microwaves); অর্থাৎ অণুতরঙ্গের উৎপাদন ও সম্প্রচারের পথিকৃৎ আচার্য বসুই। তিনি প্রায় ৬০ গিগাহার্ৎস কম্পাঙ্কের অণুতরঙ্গ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন প্রযুক্তিবিদদের আন্তর্জাতিক সংগঠন IEEE এই যুগান্তকারী ঘটনাকে একটি মাইলফলক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি নীল ফলক (blue plaque) স্থাপন করে।

* ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত এক বক্তৃতাসভায় পিরামিডীয় শিঙা-অ্যান্টেনার সাহায্যে আচার্য বসু সূর্যালোকে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের উপস্থিতির পরীক্ষামূলক প্রদর্শন করেন। পৃথিবীতে এই প্রথম তড়িচ্চুম্বকীয় হর্নের ব্যবহার করলেন কোনো বিজ্ঞানী।

* ১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে লর্ড রেলি, স্যার অলিভার লজ প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে আচার্য বসু তাঁর উদ্ভাবিত iron–mercury–iron coherer-সংক্রান্ত গবেষণাপত্র পাঠ করেন।

* ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যুলিয়েল্‌মো মার্কোনি ১৯০১ সালে কানাডার অন্তর্গত সেন্ট জন'স শহরের সিগন্যাল হিল থেকে প্রেরিত বেতার সংকেত অতলান্তিক মহাসাগরের অপর পারে গ্রাহক যন্ত্রে ধরতে সক্ষম হন। এর ফলে বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক বেতার যোগাযোগ-ব্যবস্থা চালু হল। বেতারবার্তা-প্রেরণের উদ্ভাবক হিসাবে তিনি ১৯০৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ব্রাউনের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান। IEEE-এর বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮ সালে একটি তদন্তমূলক গবেষণাপত্রে প্রমাণ করেছেন যে প্রকৃতপক্ষে আচার্য বসু দ্বারা উদ্ভাবিত coherer বা সংসঞ্জক যন্ত্রটিরই একটি সামান্য পরিবর্তিত প্রতিরূপের সাহায্যে মার্কোনি দেখান যে, ভূপৃষ্ঠের বক্রতা বেতার-সঞ্চালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এইভাবে বেতার-প্রযুক্তিবিদ্যা (radio engineering) শাখার উদ্ভব হয়। গ্যুলিয়েল্‌মোর দৌহিত্র জ্যোতির্পদার্থবিদ ফ্রান্সেস্কো মার্কোনি ২০০৮ সালে কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এসে নিজে স্যার জগদীশের অবদানের কথা স্বীকার করে তাঁকে সময়ের-চেয়ে-বহুদূর-এগিয়ে-থাকা এক বিজ্ঞান সাধক হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

* ১৯০২ সালের অগস্ট মাসে আচার্য বসু তাঁর উদ্ভাবিত গ্যালেনা সন্ধানী যন্ত্র (তাঁর ভাষায়, তেজোমিটার বা সর্বজনীন রেডিয়োমিটার)-এর জন্য ব্রিটিশ patent লাভ করেন। সিসার আকরিক গ্যালেনা (galena) দিয়ে নির্মিত বেতারতরঙ্গ-গ্রহণে সমর্থ এই সন্ধানী যন্ত্রটিই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের আদিমতম semiconductor diode detector তথা বিশ্বের প্রযুক্তি-ইতিহাসে তৈরি প্রথম semiconductor device। নোবেলজয়ী পদার্থবিদ স্যার নেভিল ফ্রান্সিস মটের মতে, বস্তুত p-জাতীয় ও n-জাতীয় অর্ধপরিবাহীর প্রথম আভাস তিনিই দিয়েছিলেন, তাও সময়ের থেকে অন্তত ষাট বছর আগেই! ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে আচার্য বসু একই ধরনের সন্ধানী যন্ত্রের জন্য মার্কিন কৃতিস্বত্ব লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এতদিন স্যার জগদীশের শুধু এই মার্কিন কৃতিস্বত্বটির কথাই জানা ছিল; কিন্তু প্রবীরবাবু সম্প্রতি তাঁর নামে দুটি ব্রিটিশ কৃতিস্বত্বের খোঁজ পাওয়ায় এ-পর্যন্ত মোট তিনটি কৃতিস্বত্বের প্রমাণ মিলল। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার ব্যাবসায়িক কৃতিস্বত্বলাভে তাঁর নিজের ঘোরতর নৈতিক অনীহা থাকলেও ভগিনী নিবেদিতা ও সারা চাপম্যান বুলের মতো বন্ধুদের উৎসাহে ও উদ্যোগেই তিনি এই তিনটি কৃতিস্বত্ব পান।

Los Angeles Examiner — The Great
Plants Can Feel, Says Dr. Bose
'Suffer, Sleep and Get Excited'
Professor Jagadish Chunder Bose and his oscillating recorder with which he measures the pulsations of plants. This picture was posed specially for the Examiner, the first he has ever had taken for a newspaper.

* আচার্য বসু নিজের বহুমুখী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শতাধিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। প্রথম দিকে লাতিন কিংবা গ্রিক ধরনের নাম না দিয়ে তিনি এসব যন্ত্রের নামকরণ করতেন ভারতীয় শব্দাংশ দিয়ে। তেজোমিটার (tejometer) ছাড়াও এই তালিকায় আসবে কুঞ্চনমান, শোষণগ্রাফ (soshunograph), বুদ্ধিমান, ইত্যাদি নাম। তবে বিদেশে এসব নামের বিকৃত উচ্চারণ শুনে পরবর্তী সময়ে তিনি এই ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হন। এরই ফলশ্রুতিতে বুদ্ধিমান যন্ত্রটির নতুন নামকরণ হয় ক্রেস্কোগ্রাফ (crescograph)।

* গাছপালাও যে প্রাণীদের মতো উত্তেজনায় সক্রিয়ভাবে সাড়া দিতে পারে, এই ধারণাও প্রথম দিয়েছিলেন আচার্য বসুই। পরবর্তী সময়ে উদ্ভিদ-স্নায়ুজীববিদ্যা (plant neurobiology) নামে বিজ্ঞানের নতুন যে-শাখার উদ্ভব হয়েছে তার প্রকৃত জনক ছিলেন এই বিজ্ঞানসাধকই। এমনকি তথাকথিত ধাতব জড়বস্তুও যে উত্তেজনায় সাড়া দিতে সক্ষম, সেব্যাপারেও তিনি গবেষণা শুরু করে অনেক দূর এগিয়েছিলেন। ১৯০০ সালে প্যারিসে আয়োজিত বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা-সম্মেলনে তিনি জড়বস্তু ও জীবের সংবেদনশীলতার মধ্যে মিল দেখিয়ে একটি বিস্তারিত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা!

* বিজ্ঞানসাধনার পাশাপাশি সাহিত্যসাধনাও করেছিলেন আচার্য বসু। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের প্রথম যুগের লেখকদের অন্যতম জগদীশ চন্দ্র ১৮৯৬ সালে 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' নামে যে ছোটোগল্পটি লিখে কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন সেটিই ১৯২১ সালে প্রকাশিত *অব্যক্ত* সংকলনে সামান্য পরিবর্তিত আকারে স্থান পায় 'পলাতক তুফান' নামে। এই কুন্তলীন-সহ একাধিক গন্ধদ্রব্যের ব্র্যান্ডের জনক ছিলেন তাঁরই আত্মীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু, যিনি H. Bose নামে খ্যাত ছিলেন। আরও মজার ব্যাপার হল, এই হেমেনবাবুই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ডা. নীলরতনের সঙ্গে জগদীশবাবুকেও বাঙালিদের মধ্যে প্রথম কলকাতার রাস্তায় সাইকেল চালানো শিখিয়েছিলেন!

বিজ্ঞান-সম্পাদক,
ভারতী ভবন
anirban.eddie@gmail.com

>>২ ফসি... এখন প্রকাশক খোঁজা সম্ভব নয়"! অনুমানে জল ঢেলে দিয়েছেন ফসি নিজেই।

সেই ১৯৬৮ সালে ওঁর বিশাল কর্ম জীবনের সূত্রপাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথে। অচিরেই পরবর্তী জীবনে উনি হয়ে উঠলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালার্জী অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস-এর ডিরেক্টর। সালটা ১৯৮৪। তখন কেউই জানতেন না করোনা ভাইরাসের এই ভয়ঙ্কর রূপের কথা। যদিও ভাইরাসটি তার চেহারা ইতিমধ্যেই পাল্টে পাল্টে যাচ্ছিল। অনেকে বলেন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সঙ্গে এর আকৃতিগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। সে ধারণাটি অবশ্য বিতর্কসাপেক্ষ। কারণ এই দুবছরে সে তার রূপকলার ঢেউয়ের যত পরিবর্তন দেখিয়েছে ফসির মত বিজ্ঞানীরা তা সামাল দিতে হিমশিম খেয়েছেন। তবে ওঁদের গবেষণার অনুসন্ধিৎসা তাতে একটুও টোল খায়নি, সে আলফা হোক বা বিটা, ডেলটা কিংবা ওমিক্রন। আরো পিছিয়ে গিয়ে বলতে হয় সারস বা মারস ভাইরাসের সঙ্গেও হয়তো এর সম্পক রয়েছে।

ভাইরাসের সঙ্গে ড. ফসির সম্বন্ধ কি আজকের? আশির দশকে মারণ ভাইরাস এইচ আই ভি যখন সবে তার পাখা ছড়াতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই ওঁর জয়ধ্বজার উত্তোলন। ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, দাদু দিদা সবাই চলে এসেছিলেন ইটালি থেকে আমেরিকায় বহু বছর আগে। ওঁর নাম শুনে সে সম্পর্কে আমাদের অবশ্য আগেই সন্দেহ হয়েছিল। যাইহোক, যুক্তরাষ্ট্র জাত অ্যান্টনির পড়াশোনা সময়মত শুরু হল। প্রথম থেকেই যে উনি তাক লাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন তা কিন্তু নয়। কারণ, ওঁর ঝোঁকটা বেশি ছিল খেলাধুলার দিকেই। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি হলে কি হবে তাতেই স্কুলের বাস্কেটবল দলের অধিনায়ক। নেতৃত্ব বোধহয় ওর সহজাত।

মোড়টা ঘুরল বাবার ফার্মাসির কাজ দেখতে দেখতে। ঠিক করলেন চিকিৎসক হবেন। স্কুল এবং কলেজ জীবন শেষ করেই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং একেবারেই চিকিৎসা বিদ্যায় যথারীতি প্রথম। আর ওঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ছোঁয়াচে রোগ। যোগ দিলেন এন. আই. এইচ-এ। মারণরোগমেধের ঘোড়ার দৌড় শুরু। আমরা পেয়ে গেলাম বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ ড. অ্যান্টনি ফসিকে। তার পরেতো সবটাই ইতিহাস।

আমরা সবাই জানি সাংবাদিকতার পরিভাষায় সাংবাদিক সম্মেলনকে বলা হয় collective interview. যেদিন ডা. ফসি তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার বিবৃতিটি পাঠ করেছিলেন সারা পৃথিবীর তাবড়, তাবড় সংবাদমাধম্যের প্রতিনিধিরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডা. ফসি বলে কথা। ছিলেন বিখ্যাত Science পত্রিকার প্রতিনিধিও। ওই পত্রিকার প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল এরকম: He battled AIDS, Covid-19 and Trump!

বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বখ্যাত এই বিজ্ঞানীকে রাজনীতির আঙিনায়ও অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ওঁর বাগবিতণ্ডা সারা দুনিয়ার সবফরধকে লেখার খোরাক যুগিয়েছে। স্থিতধী ফসি প্রতিটি যুদ্ধেরই মোকাবিলা করেছেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কারণ তিনি যে science communicationএর অন্যতম প্রবক্তা। রাজনীতির কারবারিরা অবশ্য এখনও ওঁর বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছেন। সে পদে থাকুন বা নাই থাকুন। অবশ্য এই বিরোধিতা ওঁর হাজারও পুরস্কারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (জুনিয়র) ওঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন আমেরিকার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। আর পুরস্কারের সে তালিকাটা এতই বড় যে লিখতে গেলে আমাদের জায়গায় কুলোবে না। একই সঙ্গে উনি একক বা যুগ্মভাবে বই লিখেছেন, বক্তব্য রেখেছেন নিজের বিভিন্ন কাজ কর্ম সম্পর্কে।

আর একটি কথা। ডা. ফসি যে একজন ভারত দরদী সেটা কি আমরা জানতাম? আমাদের দেশ যখন ২০২১ সালে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে ভারতের প্রতি ওঁর সমবেদনা জানিয়েছেন, প্রতিটি ভারতীয় সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিদের এ সম্পর্কে কথা বলার জন্য সাক্ষাৎকারের অনুরোধও রক্ষা করেছেন। এমন কি একথাও বলেছেন যে ভারতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ দেশের চিকিৎসক/গবেষকদের সঙ্গে কাজ করে ভারত-মার্কিন যৌথ কমিশনের আওতায় করোনার নতুন টিকা তৈরীর পথে এগোতে হবে। পৃথিবীর বহু দেশেরই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ডাঃ ফসি পেছনে লেগে না থাকলে করোনার এতগুলি টিকার আবিষ্কারও হত না বা করোনার নিত্যনতুন প্রজাতিকে বাগ মানানোও যেত না। করোনা এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি। আবার হয়তো সে মাথাচাড়া দেবে। কাজেই ওঁর নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন অবকাশই নেই।

এত কথা বলার পরে মনে হয় না কি যে এই মহামানব না হলেও অতিমানবের হাতেই এ বছরের নোবেল পুরস্কারটা ওঠা উচিৎ ছিল? চিকিৎসা বিজ্ঞানে না হোক অন্তত নোবেল শান্তি পুরস্কারটি কি উনি পেতে পারতেন না? আপনারা কি বলেন?

প্রশান্ত কুমার বসু
সম্পাদক
Scientifica Communica
ও বিজ্ঞান কহন
boseprasanta@hotmail.com

মুখ ঢাকো লজ্জায়?

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়:

কোনটা বলা উচিত জিভ কাটো লজ্জায় নাকি মুখ ঢাকো লজ্জায়? যাই বলা হোক না কেন লজ্জা নিবারণ সত্যিই শক্ত। ২০২২এ নরবলি হচ্ছে এদেশে আর হচ্ছে এমন এক রাজ্যে যে রাজ্য, ভারতে সাক্ষরতায় সব থেকে এগিয়ে থাকা রাজ্য। খবরের কাগজের এবং আরও নানান সংবাদ-মাধ্যমের সৌজন্যে এখবর আজ আমাদের সকলেরই জানা হয়ে গেছে যে কেরলে একটি নরবলির ঘটনা ঘটেছে। আর একই সঙ্গে তথ্য হিসেবে একথাও জানানো যাক যে ২০১১এর জনগণনা অনুযায়ী এদেশে সাক্ষরতায় এক নম্বর কেরলে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৩.৯১ জন সাক্ষর। শুধু সাক্ষরতা কেন, কেরল বিজ্ঞান সাক্ষরতার দিক থেকেও এক এগিয়ে থাকা রাজ্য। কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ-এর মত সংগঠনের কাজের মাধ্যমে কেরল জনবিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে বড় কৃতিত্বের দাবিদার। তাদের নেতৃত্ব শুধু যে কেরলে পরিবেশবিরোধী তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণকে রুখে দিয়েছিল তাই নয়, সাইলেন্ট ভ্যালিকে জাতীয় উদ্যানে পরিণত করতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে মালয়ালাম ভাষায় পত্র-পত্রিকা পুস্তিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও অক্লান্ত এই সংগঠন। তাহলে কি এইসব কাজ সব মানুষের মর্মে প্রবেশ করে না? সব ওপরের স্তরেই থেকে যায়?

কেউ কেউ বলছেন, হয়তো বা সঙ্গতভাবেই বলছেন, এতো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এরকম একটা ঘটনার নমুনা দেখিয়ে কোনও রাজ্যের বিজ্ঞান-মনস্কতার ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে দেওয়া কি আদৌ সমীচীন? এটা হয়তো ঠিকই যে নরবলির ঘটনা বারবার ঘটে না। তবে একেবারেই যে ঘটে না তাও কিন্তু নয়। এদিক-ওদিক এরকম ঘটনার কথা আমরা মাঝেমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে জানতে পারি। আর তখনই আমাদের টনক নড়ে। ঘটলেই আমাদের টনক নড়ে। অন্য সময়ে আমাদের গোঁজামিল দেওয়া জীবন-যাপনের দিকে আমরা নজর দিই না। কাজের জগতে বিজ্ঞান প্রযুক্তি আমাদের পরম বন্ধু অথচ জীবনযাপনে আমাদের যুক্তিবোধ কাজ করে না। পড়ার জগৎ আর দিনযাপনে দ্বন্দ্ব আমাদের নাড়া দেয় না। যা বিজ্ঞান নয়, বরং দস্তুর মত অবিজ্ঞান তাকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে আমরা তাকে বিজ্ঞানের মোড়ক দেওয়ার চেষ্টা করি আর তার ফলে বিকাশ ঘটে অপবিজ্ঞানের। রোজ যে হাঁচি, কাশি, টিকটিকির বিচিত্র তুচ্ছতায় যে আমরা জীবনযাপন করি, সেটা নিজেরাই খেয়াল রাখি না। কাজেই সমাজের বিজ্ঞান-মনকে প্রকৃত অর্থে গড়তে হলে বদলাতে হবে নিজেদের। আর তা যদি না পারি, তবে ফের এরকম ঘটনা ঘটবে আর আমরা তা দেখে বলতে বসব, ছিঃ ছিঃ, এযুগে এরকম ঘটে নাকি!

এবারে যেমন, কেরলের মতো সাক্ষরতায় এগিয়ে থাকা রাজ্যের এমন দশা আমাদের আরও বেশি হতাশ করেছে। তবে সত্যিটা এই যে, চরম কিছু একটা

সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
sabya4@klyuniv.ac.in

ব্ল্যাক হোল-এর ভবিষ্যৎ

শিবশঙ্কর রায়:

মহাবিশ্বের সে এক আশ্চর্য স্থান। স্থানটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে কোন কিছু ফিরে আসতে পারে না, এমন কি আলো পর্যন্ত না। যার জন্য সেই স্থানটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক, বিজ্ঞানের ভাষায় জায়গাটির নাম ব্ল্যাক হোল। এই অদ্ভুত কর্মকাণ্ড যে সীমারেখার মধ্যে ঘটে থাকে তাকে Event Horizon বলা হয়। তাত্ত্বিক ভাবে ব্ল্যাক হোল একটি বিন্দু হলেও এর আয়তন নির্ধারিত হয় Event Horizon এর বিস্তার এর ওপর। যেহেতু ব্ল্যাক হোল কিছুই বিকিরণ করে না তাই ব্ল্যাক হোলের আয়তন কমার কথা নয়। কিন্তু স্টিফেন হকিং কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সমন্বয়ে এমন একটি তত্ত্ব দেখালেন যেখানে ব্ল্যাক হোল থেকে ফোটন বিকিরিত হয়। এই ফোটন বিকিরণ হওয়ার ফলে ব্ল্যাক হোল কোন এক সময় হয়তো শক্তি হারিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ব্ল্যাক হোল এর Event Horizon এর কাছাকাছি প্রতিনিয়ত ভার্চুয়াল পার্টিকেল তৈরি হয়, যার একটি পার্টিকেল ও আর একটি অ্যান্টি-পার্টিকেল, যারা স্বাভাবিক নিয়মে একে অপরের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে অ্যান্টি-পার্টিকেলটি ব্ল্যাক হোলের দ্বারা শোষিত হয়। অবশিষ্টাংশ পার্টিকেলটিকে বিকিরণের আকারে দেখা যায় যেটি Hawking Radiation নামে পরিচিত। এই বিকিরণটি হয় Event Horizonএর আশপাশের অ্যান্টি-স্পেস দিয়ে। ব্ল্যাক হোল যেহেতু অ্যান্টি-পার্টিকেল শোষণ করছে, এতে তার মোট শক্তি কমে আসছে এবং কোন একটি সময় ব্ল্যাক হোলটি হয়তো অদৃশ্য হয়ে যাবে। ব্ল্যাক হোল evaporation সমীকরণ অনুসারে দেখা যায় সব থেকে ছোট ব্ল্যাক হোলটির বিকিরণের তুলনায় মহাবিশ্বের Cosmic Microwave Background Radiation শোষণ করার পরিমাণ খুব বেশি। তার মানে ব্ল্যাক হোলটি ছোট হওয়ার পরিবর্তে পুনরায় বড় হবে। তাহলে Hawking Radiation কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? যদি বিগ ব্যাং এর সময়কালে কোন আদিম ব্ল্যাক হোল তৈরি হয়ে থাকে, সময়ের সাথে তার ভরও কমতে থাকবে, তাতে ব্ল্যাক হোলের বিকিরণ শক্তি বিশেষ আকারে বাড়তে বাড়তে বর্তমান সময়ে গামা রশ্মি বিস্ফোরণ হওয়ার কথা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে সকল গামা রশ্মি বিস্ফোরণ হতে দেখা গেছে সেগুলিতে এইরকম বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি। তবে আমরা বলতেই পারি যে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে হকিং, তাপগতিবিদ্যা, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং আপেক্ষিকতার সংমিশ্রনে ভবিষ্যৎ এর কোয়ান্টাম মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের প্রথম ধাপের সূচনা করেছেন।

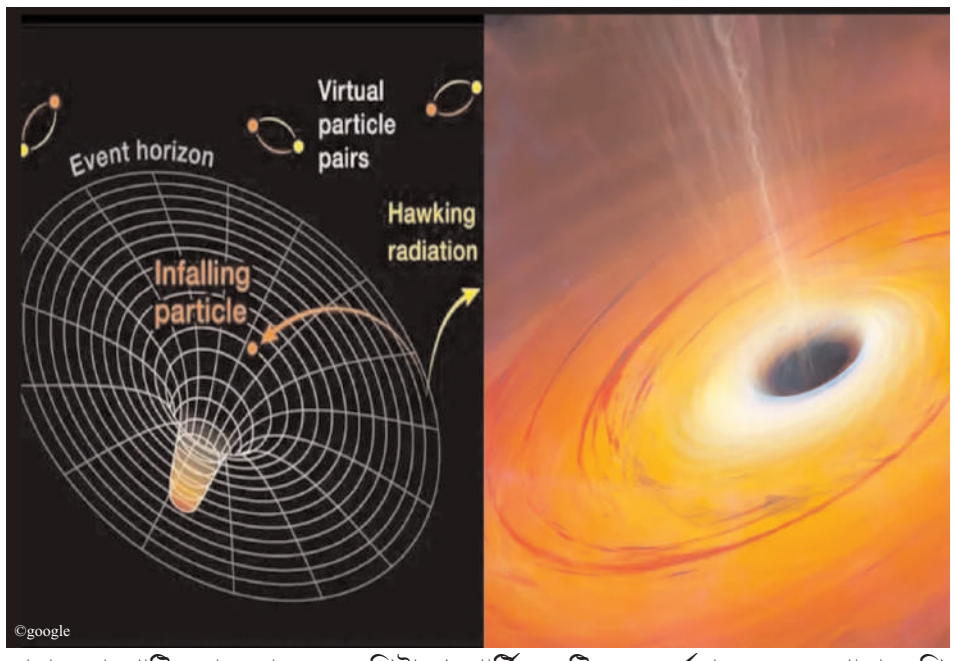

রিসার্চ স্টুডেন্ট,
কগ্নিটিভ অ্যান্ড সাইবারনেটিক্স ল্যাব, আইএসআই, কলকাতা ও
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিওলজি,
ইউনিভারসিটি অফ ক্যালকাটা
electrobiophysics@gmail.com

রত্নধারণ : ইতিহাস, বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান

সঞ্চলিতা ভট্টাচার্য:

অলঙ্কার হিসেবে মূল্যবান রত্নের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। ভারতীয় উপমহাদেশে মেহেরগড়ের মতো নব- প্রস্তরযুগীয় সভ্যতাতেও রত্ন ব্যবহারের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমরা জেনেছি, এই প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের মানুষরাও আফগানিস্তান থেকে আমদানি করা লাপিস লাজুলি ও ইরান থেকে নিয়ে আসা নীলকান্তমণি ব্যবহার করতেন। কিন্তু শুধুই সাজসজ্জার প্রয়োজনেই মানুষ অঙ্গে রত্ন পরিধান করে না। বেশ কিছু ক্ষেত্রে রত্ন ব্যবহারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ভাগ্যবিশ্বাস।

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, কিছু কিছু রত্নের সংস্পর্শ মানুষের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। গ্রীক এবং ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী রাশিচক্রে বর্ণিত বারোটি রাশির জন্য আলাদা আলাদা পাথর রয়েছে। এর মধ্যে নয়টি রত্নকে অত্যধিক শক্তিশালী বলে বিশ্বাস করা হয়। একত্রে তারা 'নবরত্ন' নামে পরিচিত। এগুলি হল - হীরা, পোখরাজ, নীলা, চুনি, পান্না, প্রবাল, মুক্তা, গোমেদ এবং ক্যাটস আই।

গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, অঙ্গসৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যেই অলঙ্কার হিসেবে মানুষ দৃষ্টিনন্দন এই রত্নগুলিকে ব্যবহার করা শুরু করেছিল। পরে এগুলির সঙ্গে ভাগ্যবিশ্বাস জুড়ে যায়। আবার, বাংলাদেশের গবেষক রিদওয়ান আক্রামের মতো কারো কারোর মতে, বিশ্বাস থেকেই ধাতু ও রত্ন ব্যবহারের সূচনা। সেগুলির অলঙ্কার রূপ লাভ পরের ঘটনা।

সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও ভাগ্য পরিবর্তন - এর মধ্যে মানুষ কোনটির প্রয়োজন প্রথম অনুভব করে রত্নকে অঙ্গে পরিধান করে, সে বিষয়ে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু রত্নের সঙ্গে ভাগ্য বিশ্বাসের এই সংযুক্তির ঘটনাটি অনস্বীকার্য। এই বিষয়ে গবেষক আক্রামের মত অনুসরণ করে বলা যায়, প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশ থেকে উঠে আসা অপবিজ্ঞান থেকেই এর সৃষ্টি হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রত্ন ব্যবহার করলে ভিন্ন ভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, এই ছিল বিশ্বাস।

আসলে, প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে আদানপ্রদানের অভিজ্ঞতায় মানুষ দেখেছে যে বেশ কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ওষুধ হিসেবে খেলে অনেক রোগ সেরে যায়। আবার কিছু কিছু গাছ, পাতার নির্যাস অঙ্গে প্রলেপ হিসেবে লাগালে খুব দ্রুত শরীরের বিভিন্ন ক্ষত ও প্রদাহ নিরাময় হয়। রক্তপাত

বন্ধ করতে এবং বিভিন্ন চর্মরোগের চিকিৎসায় এগুলি কার্যকরী ফল দান করে।

কিন্তু মানুষ এটা বোঝেনি যে এটা সম্ভব হয় এই সকল গাছ, পাতা, শেকড়ের মধ্যে থাকা ওষধি উপাদানগুলির কারণে। তাই, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন বস্তু রোগ নিরাময় করতে পারে, এমনটা জানা থাকলেও কি কারণে এবং কোন পদ্ধতিতে সেগুলি ক্রিয়া করছে, তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা মানুষের জানা ছিল না। সে মনে করেছে যা কিছু দুর্লভ তাই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। দুর্লভ ও সুন্দর রত্নগুলিও তাই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

পেশাদারি জ্যোতিষীরা এই অবিজ্ঞানকে প্রচার করেন জেনে বুঝে অসাধু উপায়ে অর্থ রোজগার করার জন্য। শুধুমাত্র অসুখ সারানোই নয়, দুর্ঘটনা এড়ানো, মামলায় জয়লাভ, বিবাহ ইত্যাদি সকল বিষয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য জ্যোতিষরা রত্ন ধারণ করতে বলেন। আশ্চর্যের কথা, তথাকথিত শিক্ষিত, আধুনিক মানুষরাও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে দাঁড়িয়ে এইসব অবিজ্ঞানের অনুশীলন করে চলেছেন।

আসলে কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা অবিজ্ঞান তা বিচার বিশ্লেষণ করে আলাদা করবার একমাত্র উপায় মানুষের বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির অনুশীলন। বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত দিকে যতই উন্নতি আমরা অর্জন করি না কেন, চিন্তাগত দিক থেকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে না পারলে এই অবিজ্ঞানের ফাঁদ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমানে বিভিন্ন অলঙ্কার প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলির বিজ্ঞাপনের ফলে গ্রহরত্নের প্রচার বেড়েই চলেছে। এগুলিকে আকর্ষণীয় করার জন্য অন্যান্য গয়নার মতো বহুরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ ডিজাইনও যুক্ত করা হচ্ছে। গয়নার দোকানে সাধারণ গয়নার মতোই এগুলি বিক্রি হচ্ছে।

অপবিজ্ঞানের এই বাড়বাড়ন্ত চিন্তার কথাতো বটেই। কিন্তু তার পাশাপাশি আরও একটি বিষয় রয়েছে। অলঙ্কার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক নিরুচ্চার সাক্ষ্য। তার সঙ্গে অবিজ্ঞান চর্চার সীমারেখাটির স্পষ্টতা কমে আসাও এক বিপজ্জনক ইঙ্গিত।

এম.ফিল. গবেষক
ইতিহাস বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
sanchalitabhattacharyya@gmail.com

বর্ষার রোগ: ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া...

নবীনা রায় মজুমদার:
বর্ষা যেন গিয়েও যায় না। আসে সে নূপুর পায়ে ঝমঝমিয়ে। কবিগুরু লিখেছেন, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল... রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপিত বর্ষা আজও আমাদের মধ্যে অনুরণন সৃষ্টি করে।

আবার এই বর্ষার আগমনে নাজেহাল হয় দেশের মানুষ। অতি বৃষ্টির অন্যান্য অসুবিধার সঙ্গে অনুষঙ্গ হয়ে আসে নানা রকমের রোগবালাই। এইসব রোগ ব্যাধির সঙ্গে রয়েছে করোনা ভাইরাসও। আর এবারে সক্রিয় রয়েছে ডেঙ্গুও। অতিবৃষ্টির প্রকোপে নতুন আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও রোগ আরো জটিল আকার ধারণ করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্ষা কালে বায়ুবাহিত, জলবাহিত এবং মশা বাহিত রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। ওঁদের কথায়:

ম্যালেরিয়া: মশার প্রজনন কাল হলো বর্ষাকাল। বিশ্বব্যাপী ডেঙ্গু তে ৩৪% এবং ম্যালেরিয়া তে ১১% মানুষ আক্রান্ত হন এই ঋতুতে। অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশার দ্বারা এই রোগ ছড়ায়। এই সময় ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এই রোগের

লক্ষণে বেশ কিছু দিন ধরে উঁচু দিকে জ্বর থাকে। সঙ্গে কাঁপুনি। অনেক ক্ষেত্রেই ম্যালেরিয়া বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

ডেঙ্গু: এডিস অ্যাজিপটাই মশা ডেঙ্গু রোগ বহন করে। বর্ষাকালে জমা জলে এই ধরনের মশা প্রজনন ঘটায়। এই মশা কামড়ানোর পরে ৪-৭ দিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকেন রোগী। অনেকের ক্ষেত্রে ডেঙ্গু মারাত্মক রূপ নেয়, প্লেটলেট নেমে গিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় রোগীকে।

ডায়েরিয়া: জলবাহিত রোগের মধ্যে অন্যতম এই রোগ। দূষিত জল ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, অপুষ্টি ও কৃমির আক্রমণে ডায়েরিয়া হতে পারে। এর ফলে পেটের সমস্যা, পেটে ব্যাথা কিংবা জ্বর হয়। ডায়েরিয়ার পাশাপাশি আমাশারও প্রকোপ বাড়ে।

টাইফয়েড: সালমোনেলা টাইফি নামক এক ধরনের জীবাণুর সংক্রমণে এই রোগ হয়। এটি জলবাহিত রোগ। খোলা বা নষ্ট হওয়া খাবার খাওয়া বা দূষিত জল পান করার মাধ্যমেই এই রোগ হতে পারে। মাথা ব্যাথা, জ্বর, গলা ব্যাথা এই রোগের লক্ষণ।

জন্ডিস: দূষিত জল এবং খাবারের কারণে জন্ডিস হতে পারে। এতে লিভারের সংক্রমণ হয়ে থাকে। জন্ডিস হলে রোগীর দুর্বলতা, অবসন্নতা, হলুদ প্রস্রাব, বমি বমি ভাব অনুভূত হয়।

হেপাটাইটিস - এ:
হেপাটাইটিস-এ দূষিত জল এবং খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়। এর ফলে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফুলে উঠতে পারে। এই ঋতুতে শিশুদের এবং বয়স্কদের বায়ুবাহিত রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। যার ফলে জ্বর সর্দি কাশিতো হয়ই। শ্বাসকষ্টও বেড়ে যায়। প্রকৃতির নিয়মে বর্ষা তো আসবেই। কিন্তু আমাদের সুস্থ থেকে বর্ষার মোকাবিলা করতে হবে। কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে অবশ্য রোগমুক্ত থাকা সম্ভব। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেন:

* বর্ষার সময় জল ফুটিয়ে খান। দিনে ৭-৮ গ্লাস জল খাবেন। জল শরীরের বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়। সুস্থ থাকতে পর্যাপ্ত জল খান, এতে ডিহাইড্রেশনমুক্ত থাকতে পারবেন।
* মশা থেকে বাঁচতে মশারির ব্যবহার বাধ্যতামূলক। বাড়ির চারদিকে জমা জল যাতে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন। জমা জলে মশারা ডিম পাড়ে।
* ফাস্টফুড, ভাজাভুজি নৈব নৈব চ।
* পাতে রাখুন ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার, যা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করবে। ভিটামিন সি যুক্ত ফল ও সবজি খান। এতে চট করে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম।
* খাওয়ার আগে ফল ও সবজি ভালো করে ধুয়ে নিন। অথবা নুন জলে ভিজিয়ে রাখুন। এতে সবজি বা ফলের গায়ে জীবাণু লেগে থাকলে তা সহজে দূর হবে।
* গলা ব্যাথা, জ্বর, সর্দিকাশি এই সব থেকে দূরে থাকতে উষ্ণ গরম জলে নুন মিশিয়ে গারগল করুন। । বৃষ্টিতে ভেজা জামা বেশিক্ষণ গায়ে রাখবেন না।
* বর্ষায় অবশ্যই জামা কাপড় ইস্ত্রি করে পরুন। এই সময় জামা কাপড় রোদ না পাওয়ায় হাওয়ায় শুকোয়। যার জেরে ছত্রাক জন্মায় পোশাকে। এর ফলে চুলকুনি হয়। কিন্তু ইস্ত্রি করে পরলে সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

পরিশেষে বলি, বর্ষায় শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে না জেনে ওষুধ খাবেন না। ভুল ওষুধ শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি করে। দরকারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

নবীনা রায় মজুমদার
অনুষ্ঠান প্রযোজক,
রেডিও কলকাতা
nabinaray06@gmail.com

কোভিড বর্জ্যে বাড়ছে দূষণের বোঝা

তন্ময় পাল: বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত স্বাস্থ্যের জন্য গভীর সংকট বয়ে এনেছে। বর্তমান কোভিড ১৯ অতিমারীর কারণে প্লাস্টিকের ব্যবহার, প্লাস্টিকের বর্জ্য আমাদের বাস্তুতন্ত্রের প্রতি চরম আঘাত হানছে যা গোটা পৃথিবীর শ্বাসরোধ করে ফেলছে ও সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের (সিপিসিবি, ভারত সরকার) সমীক্ষা অনুযায়ী, আমাদের দেশে ২০২০ সালের জুন থেকে ১০ মে, ২০২১ সালের মধ্যে ৪৫,৩০৮ টন কোভিড-১৯ বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য উৎপাদন হয়েছে, যা প্রতিদিন গড়ে ১৩২ টন কোভিড সম্পর্কিত বর্জ্য উৎপন্ন করেছে। করোনা-পূর্ব সময়ে প্রতিদিন ৬১৫ টন বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য উৎপন্ন হোত এবং তা অতিমারীর কারণে ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে!

মহারাষ্ট্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর মে মাসে সে রাজ্যে বায়োমেডিক্যাল বর্জ্যের পরিমাণে ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যেখানে কোভিডের আগে দৈনিক উৎপাদন ছিল ৬২,০০০ কেজি। সিপিসিবি গত বছরের জুলাইয়ে কোভিড বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তার সংশোধিত নির্দেশিকাতে বলেছিল, রাজ্যগুলি তাদের কোভিড বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য মোকাবেলার জন্য পরিবেশ মন্ত্রকের 'বিপজ্জনক বর্জ্য চিকিৎসা, সংগ্রহস্থল এবং নিষ্পত্তি সুবিধার' সাহায্য নিতে পারে। কোভিড-১৯ অতিমারীর ক্রমবর্ধমান বিস্তার বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলেছে।

সাধারনতঃ সূঁচ, সিরিঞ্জের মতো ধারালো বস্তুগুলি সাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং ভাঙা বা ফেলে দেওয়া এবং দূষিত কাচের জিনিসপত্র, ওষুধের শিশিসহ দ্রব্য বস্তু ইত্যাদি নীল শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ

করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিবেশ কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোভিড-এর বিস্তার রোধের নির্দেশিকাগুলির মধ্যে রয়েছে ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছাকাছি তাপমাত্রায় বর্জ্য (যেমন টিস্যু, মাস্ক, রুমাল এবং অনুরূপ জৈব এবং প্যাকেজিং বর্জ্য) সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করতে হবে।

অতিমারীর সময় প্লাস্টিক দূষণের কারণে গোটা বিশ্বকে বেশ কয়েকটি পরিবেশগত জটিল সমস্যার সম্মুখীন করেছে। মাস্ক-এর মত ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম বিশ্বব্যাপী গ্রহণের কারণে, ভবিষ্যতের গবেষণার লক্ষ্য হওয়া উচিত মাস্ক, গ্লাভস সহ বায়োডিগ্রেডেবল এবং পরিবেশ বান্ধব প্রতিরক্ষামূলক বস্তুর উদ্ভাবন করা।

সর্বশেষে এটা বলা উচিত যে অতিমারী কে জয় করতে আমরা সক্ষম হবই। কিন্তু গত দু বছরের সময়কালে করোনা সম্পর্কিত দূষণ পৃথিবীকে এক চরম বিপত্তির মধ্যে দাঁড় করিয়েছে, তার থেকে নিস্তার পেতে গেলে খুব কঠোর ভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন

ছাত্র
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন
paultanmoy.08@gmail.com

উপকারী লবঙ্গ

মীনাক্ষী দে:
(Szzygiumaromaticum) - লবঙ্গ একটি গাছের সুগন্ধি ফুলের কুঁড়ি। এগুলি সাধারণভাবে টুথপেস্ট, সাবান বা প্রসাধনী সামগ্রীতে সুগন্ধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। লবঙ্গ তেলে ইউজেনল পাওয়া যায় যা দাঁতের ব্যথা এবং অন্যান্য ধরনের ব্যথার জন্য কার্যকর। লবঙ্গ-প্রোটিন, আয়রন, কার্বো-হাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, ও সোডিয়ামে ভরপুর। আবার এতে ভিটামিন সি, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন কে থাকে। এই লবঙ্গ শুধুমাত্র খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির কাজই করে না বরং

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতেও এই ছোটে ফুলের মতো দেখতে মসলাটির জুড়ি মেলা ভার।

সকালে খালি পেটে লবঙ্গ খেলে একাধিক সুফল পেতে পারেন।
১. রোগ প্রতিরোধে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
২.খাবার হজম করতে সাহায্য করে। এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের মত সমস্যা হয়না।
৩. লিভার এর কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে
৪. দাঁতের ব্যাথা দূর হয়।
৫.মাথাব্যথাকে সারিয়ে তোলে।
৬. হার্টের জন্য উপযোগী
৭. গ্যাসের সমস্যা থাকে না।
৮. সর্দি-কাশির ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়।
৯.মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

প্রাক্তন অধ্যাপক,
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ,
কলকাতা
deminakshi1965@yahoo.com

>>১ কিছু কথা ১...

তাই আবারও সেই শান্তির বার্তা।

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের আরও বড় দিক আছে। যেমন, দেশগুলির মধ্যে বিজ্ঞানের আদানপ্রদানে বহুবিধ কাজে শামিল হওয়ার জন্য বিজ্ঞানের সকল কাজে ও পরীক্ষায় বিবিধ সহায়তা নিয়মিত পাওয়া ও পেতে থাকা। এই নিয়ে নির্দেশিকা হিসেবে বেশ কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ইউনেস্কো অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমীক্ষায় নতুন প্রযুক্তির বিষয় হিসেবে অটোমেশন, রোবটিক্স, ইলেকট্রিক গাড়ি, জীবপ্রযুক্তি, কৃত্রিম মেধা বিষয়ে অগ্রগতির কথা বলেছে আর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশের উপর তাদের প্রভাব বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছে। প্রকাশিত হয়েছে স্থিতিশীল উন্নয়নের কর্মসূচি ১৭টি লক্ষ্য নিয়ে। এর সঙ্গে জড়িত আছে ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতার কথাও।

মৌলিক বিজ্ঞানে গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ দেশে দেশে এক এক রকম। ইউনেস্কোর ৮৬টি দেশকে নিয়ে এক সমীক্ষায় দেখা যায় এই হার কোনো কোনো দেশে শতকরা ১০এর কম, কোন দেশে ৩০এর বেশি। বিজ্ঞান যে অবিরাম বহু চিকিৎসার প্রতিরোধে, রোগ নিরাময়ে, মৌলিক কাজ করে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক আবিষ্কারই মানুষকে জীবন দান করেছে। এখন গাণিতিক মডেলিং আকাশ-বিদ্যা, সমুদ্রচর্চা, বিপর্যয় মোকাবিলা, বন সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীব-বৈচিত্র, অপরাধ মোকাবিলায়, মেসিন লারনিং-এও প্রয়োগ হচ্ছে।

আমাদের দেশ মৌলিক গবেষণায় কতখানি এখন এগিয়ে রয়েছে তাও বিচার্য হোক। শোনা যাচ্ছে বিজ্ঞানে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুদান প্রত্যাখ্যানের কথা, বহু বিজ্ঞান দপ্তরের সংকোচনের কথাও। এই পদক্ষেপ আমাদের দেশে বিজ্ঞান প্রসারে ও প্রচারে এই দিবস উদযাপনের পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। সরকারকে প্রয়োজনে বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করে বিজ্ঞান চর্চার আবহাওয়া বজায় রাখতেই হবে। না হলে অন্যদের তুলনায় দেশের অগ্রগতি পিছিয়ে যাবে।

দেবপ্রসন্ন সিংহ
ফেলো,
কম্পিউটার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া
devaprasannasinha@rediffmail.com

>>১ কিছু কথা ২...

সরকারের অনুমোদন মেলে ১৯৮৭ সালে। এই দিনটি আসলে প্রখ্যাত ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন-এর 'রামন এফেক্ট'-এর আবিষ্কারের সম্মানে পালন করা হয়। পালনের বিষয় প্রতিবছর আলাদা আলাদা থাকে। সমগ্র দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে এবং বিজ্ঞান-কারিগরী-চিকিৎসা গবেষণা সংস্থায় এই দিনটি বিশেষ ভাবে পালিত হয়ে থাকে। শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানব জীবনে দৈনন্দিন কাজে বিজ্ঞানের সাফল্য সঠিক ভাবে প্রয়োগ ও প্রচার। এটি করতে হলে প্রান্তিক মানুষগুলির পেশাগত দিকগুলিকে বিবেচনার আওতায় আনা দরকার। ভারত তথা বিশ্বের শহর ও গ্রামীন জীবনে পেশাগত বিভিন্নতা রয়েছে। মানুষের পেশাগত জীবনের কষ্ট লাঘব করার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের বিশেষ গবেষণা ও প্রযুক্তি সহায়তা। প্রয়োজন

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ও প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন বিষয়গুলি সুনির্দিষ্ট করে গবেষণার আওতায় এনে জটিল ও কষ্টসাধ্য বিষয়গুলিকে সহজ করা।

বলা যেতে পারে এক্ষেত্রেও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে বিজ্ঞান। বিভিন্ন গবেষণা, তথ্য ও প্রযুক্তির সাহায্যে আজ প্রান্তিক মানুষেরও জীবন যাপনের মান উন্নত হচ্ছে। এই দিনটির উজ্জ্বলতা আরও বাড়বে যেদিন বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বল মানুষটিও সচেতন, সবল ও সাফল্যমণ্ডিত হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে। তবেই উজ্জ্বলতা বাড়বে বিজ্ঞান দিবসের।

সেখ জিন্নাত আলি
সায়েন্স কম্যুনিকেটর ও ছাত্র
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন
sjasciencecommunicator@gmail.com

কিশলয়ের আঙিনায়

সৌজন্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শিশু শ্রেণী
গড়িয়া বিদ্যাভবন স্কুল

অনীক চ্যাটার্জী
তৃতীয় শ্রেণী
ভারতীয় বিদ্যাভবন, সল্টলেক

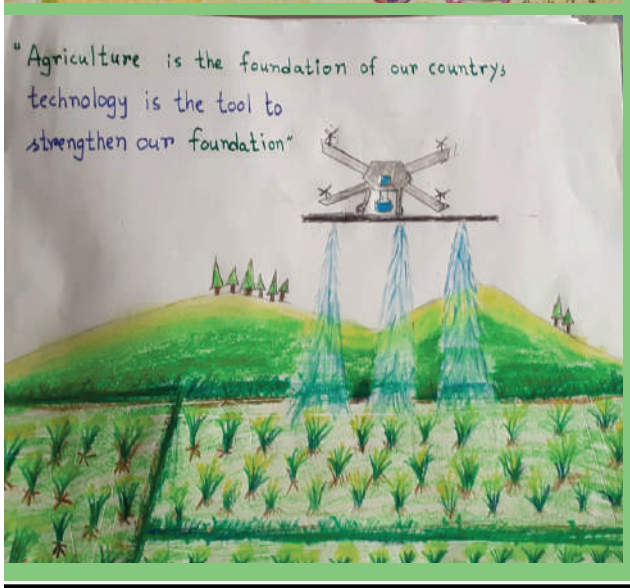

শ্রীহান বিশ্বাস
তৃতীয় শ্রেণী
রামমোহন মিশন স্কুল

মজার বিজ্ঞান

তুহিন সাজ্জাদ সেখ:

সবেমাত্র দু'দিন হয়েছে,ওর সপ্তম জন্মদিনের পার্টি শেষ হওয়া পর্যন্ত। আমার ভাইপো ওই দিন তরমুজ খেতে গিয়ে কয়েকটা বীজও খেয়ে ফেলেছিল। এটা কোন ব্যাপার না, এরকম তো আমাদেরও হয়! তবে আজ সকাল বেলায় আমি একটু মজা করেই বললাম, রিফ- সেদিন যে তুই তরমুজের বীজ খেয়ে ফেলেছিলিস না, দেখবি তোর পেটে তরমুজ গাছ জন্মাবে।

ও প্রথমে একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, তারপর বলে উঠলো- "হবে না কারণ পেটের মধ্যে কোন সূর্যের আলো নেই, তুমি ভুল জানো আর এ জন্যই তুমি কলেজে ফেল করেছিলে!"

যদিও আমি ফেলু ছাত্র, তবুও বৌদিমণি আমাকেই প্রতিদিন বিকেল বেলা রিফ কে ওর হোমওয়ার্কে সাহায্য করতে বলেছেন। ওই দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যথারীতি আমরা বই নিয়ে বসে গেছি, হঠাৎ রিফ আমাকে জিজ্ঞেস করল- "আচ্ছা কাকাই বিজ্ঞান বই আর অঙ্ক বইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?"

আমি হতভম্ব হয়ে, একটুখানি মাথা চুলকিয়ে বললাম "ওদের মধ্যে পার্থক্য হলো অঙ্কের বইতে শুধু মাত্র প্রচুর প্রচুর সমস্যা থাকে!"

এই কথা শুনে আমরা দুজনেই একসাথে হেসে উঠলাম; অদূরে দাঁড়িয়ে দেখি বৌদিমণিও আমাদের দেখে মুচকি হাসছেন!

লোকবিজ্ঞান লেখক
ও
আলেখ্যকার

অঙ্কুরে বিনাশ

সীমা মুখোপাধ্যায়:

একটা প্রবাদ আছে অঙ্কুরে বিনাশ। একটা বীজকে যদি অঙ্কুরিত হতে না দেওয়া যায় তাহলে বীজ থেকে চারা গজাবে না। চারা থেকে বৃক্ষ তৈরি হবে না। খুব স্বাভাবিক বীজকে অঙ্কুরিত হতে না দিয়ে সূচনা পর্বেই বাড়তে না দিলে মহীরূহ হওয়ার কোন সুযোগই নেই। বর্তমানে প্লাস্টিক বর্জ্যজনিত দূষণ, দানবরূপে পৃথিবীর টুঁটি টিপে ধরেছে। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম প্রধান অস্ত্র অঙ্কুরেই বিনাশ করা। কিন্তু সেটা কিভাবে করা যাবে? ব্যাপারটা সুখী গৃহকোণ থেকেই শুরু করা যেতে পারে।

আমরা পছন্দ করি বা না করি, ঘরে ঘরে প্লাস্টিকের মোড়ক হু হু করে ঢুকে পড়ছে। কাপড় বা চটের থলি হাতে বাজারে গেলেও এর হাত থেকে রেহাই নেই। চাল ডাল নুন তেল সবই কিন্তু এখন পাওয়া যায় প্লাস্টিকের প্যাকেটে। বিস্কুট, চানাচুর, নানান ধরনের ভুজিয়া ইত্যাদি মুচমুচে রাখতে রুপালি আস্তরণ দেয়া সুদৃশ্য রঙিন নানা মাপের প্যাকেটে ঝোলানো থাকে ছোট বড় সব দোকানেই। ফলের রস চাইলে তাও পাওয়া যাবে রুপালি আস্ত রণে মোড়া টেট্রা প্যাকেটে। অতএব গৃহকোণের জঞ্জাল ফেলার পাত্রটি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সূচনাপর্বেই পৃথকীকরণের (segregation at source) কথা বলা হয়। তাই এইসব বর্জ্য এক জায়গায় জমা না করে আলাদা আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক লাভ । কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (solid waste management) প্রাথমিক ধাপ সহজেই পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। কথাটা গুরুগম্ভীর শোনালেও সত্যি। কোন কোন এলাকায় কঠিন বর্জ্যকে আলাদা আলাদা করে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। যেখানে সে ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত তৈরি হয়নি সেখানে আমরা নিজেরা কি একটু এগিয়ে আসতে পারি না?

রান্নাঘরের সবজি খোসা আলাদা করে রেখে খুব সহজেই জৈব সার তৈরি করা যায়। আর পাতলা পলিব্যাগ জমিয়ে নানান কিছু তৈরি করা যেতে পারে। না পারলে অনেক পলিব্যাগ বড় একটা পলি ব্যাগে জমিয়ে বিশাল একটা বোচকা বানিয়ে ঘরের বাইরে রেখে অন্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর রুপালি আস্তরণের প্যাকেট নানান ভাবে ব্যবহার করা যায়। তবে ব্যবহার করার সময় প্যাকেটগুলো এবড়ো খেবড়ো করে ছিড়লে চলবে না। কাঁচি দিয়ে কেটে টান টান করে মোটা ভারি বইয়ের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। ঘরের কোন উৎসবে ঘর সাজাতে রঙিন কাগজ না কিনে এই রুপোলি কাগজ ব্যবহার করে ঘর সাজানো যেতে পারে। তাছাড়া ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ছোটদের নাচ-গান-নাটকে রুপোলি প্যাকেট কেটে জমকালো পোশাক বা গয়না তৈরি করা যায়। অনুষ্ঠান শেষে ব্যবহৃত জিনিস বড় কালো প্যাকেটে ভরে তা দিয়ে আকর্ষণীয় জীবজন্তুর আকার বা

মজার মুখ বানানো যেতে পারে। অনেকদিন বাদে যখন এইসব বানানো জিনিস বিবর্ণ হয়ে যাবে একসঙ্গে করে জড়ো করে যেখানে রিসাইক্লিং হয়, সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বেশ কিছু এনজিও এই ব্যাপারে নিরলস কাজ করে চলেছেন। প্রয়োজনে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রাক্তন সম্পাদক
জীবন কথা
sima.ekdalia@gmail.com

বিজ্ঞানের ধোঁয়ায় ঘনাদা

তিথি রায়:

আট থেকে আশি, আমরা আড্ডা ভালোবাসি। আর আড্ডায় যদি থাকে নিখাদ বিজ্ঞান তাহলেতো কথাই নেই। কিন্তু তাও কি সম্ভব? হ্যাঁ, এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। সে বিষয়ে জানতেই আমাদের পৌঁছে যেতে হয় কলকাতার ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ি, অর্থাৎ ঘনাদার আড্ডায়।

ঘনাদার আড্ডায় পরিচিত সঙ্গী-সাথীরা হলেন শিবু, শিশির, গৌর ও সুধীর। ঘনাদার পুরো নাম শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস। বয়সের কোনো গাছপাথর নেই। ভোজনবিলাসী, ধূম্রপায়ী ঘনাদা গুল দেওয়ার জন্য বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য যে সমস্ত চরিত্র গুল দেওয়ার জন্য বিখ্যাত তার থেকে ঘনাদার গালগল্প খানিক আলাদা। গুল-ই-গুলজার ঘনাদার গুল মূলত বৈজ্ঞানিক যুক্তি নির্ভর। আর সেসব শুনতে শুনতে পাঠককে গুলে মশগুল হতেই হয়।

একটি সাক্ষাৎকারে লেখক ঘনাদা সম্পর্কে বলেছিলেন, "বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লেখার সময় একজন হিরোর দরকার পড়ল। বিদেশি সায়েন্স ফিকশনের হিরোকে দেখা যায় যেমন বিদ্যাদিগগজ তেমনই তার গায়ের জোর। আমি হিরো করলাম একজন সাধারন অনুভুক বাঙালিকে। সে কলকাতার মেসের ভাত খেয়ে এমন শক্তিমান যে তার মুখের জোরে ধারেকাছে কেউ দাঁড়াতে পারেনা। পাঠকের কাছে ঘনাদা তাই এত ভালোবাসা পেয়েছে"।

ঘনাদা কি তবে বিজ্ঞানী ছিলেন? এর উত্তরে সরাসরি হ্যাঁ বলা না গেলেও, ঘনাদা কোথাও বিজ্ঞানমনস্ক, কোথাও প্রখর উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী, কোথাও আবার সরাসরি বিজ্ঞান গবেষণার সাথে জড়িত।

আসলে, ঘনাদা চরিত্রটির মধ্যে লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিজ্ঞান প্রেম এবং বিজ্ঞান মানসিকতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালে প্রেমেন মিত্তিরের 'মশা' গল্পের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জগতে ঘনাদার আবির্ভাব ঘটে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত লেখা হয়েছিল ঘনাদার গল্প ও উপন্যাসগুলি। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'নুড়ি' গল্পটিতে দেখতে পাই ঘনাদা গিয়ে পৌঁছেছেন নিউজিল্যান্ডের উত্তরে আনাওয়া দ্বীপে। এই দ্বীপ সংলগ্ন একটি পাহাড়-দ্বীপ স্থানীয় বাসিন্দাদের মতানুসারে অপদেবতার বাসস্থান। বিজ্ঞানমনস্ক ঘনাদা তা মানতে একেবারেই রাজি নন। তিনি সেখানে অভিযান চালিয়ে আবিষ্কার করেন দ্বীপটি একটি আগ্নেয়গিরি এবং তা থেকেই ধোঁয়া ওঠা সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা। যা দেখে স্থানীয় মানুষ অপদেবতার

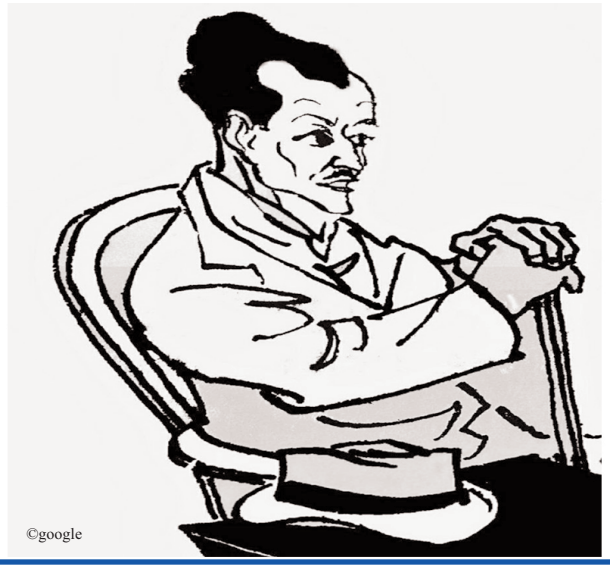

কীর্তিকলাপ বলে মনে করে তার জন্য দ্বীপের ভূতাত্ত্বিক গঠন দায়ী। গল্পের শেষে পরিলক্ষিত হয় ঘনাদা একটি নুড়ি তুলে ফেলার ফলে সমগ্র পাহাড়-দ্বীপ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক, মানুষের মনের যাবতীয় কুসংস্কারকে ভাঙ্গার বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছেন।

তেল, চোখ, মাটি, শাঁখ ইত্যাদি গল্পগুলিতে আমরা পাই পরিবেশপ্রেমী ঘনাদাকে সেখানে তিনি পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও উদ্ভাবনকেই হাতিয়ার করেছেন। ঘনাদার গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে মূলগত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছাড়াও, বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানোর বার্তা রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে এক মুক্ত চিন্তার পরিসর যা আজকের দিনেও বিজ্ঞানী সমাজ সহ সারা পৃথিবীর কাছে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এসব ছাড়াও গল্প-উপন্যাস গুলির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল সমকালীনতা। লেখাগুলি প্রকাশকালের সমকালীন বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিজ্ঞানীমহলের চিন্তার বিষয় কাহিনীর প্রধান উপজীব্য বিষয়।

শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন, "ঘরের মধ্যে তক্তপোশে গোটা চারেক এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে একটা নীচু মোড়ায় বসে ঘনাদার নবতম অভিযানের গল্প লিখছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বৈজ্ঞানিক তথ্যে পাছে কোনো ভুল বা বিচ্যুতি ঢুকে যায় তাই সতর্কতা আর যত্নের শেষ নেই"। ঘনাদা যতই গুল দিন না কেন, গল্পের মধ্যে পরিবেশিত ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান সবটাই নির্ভুল।

এককথায় বলা যায়, গুলবাজ ঘনাদা চরিত্রটি সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট মেলবন্ধন। সেই কারণেই, বাংলা সাহিত্যের সব বয়সের পাঠকের কাছে এটি চিরসমাদৃত।

ছাত্র
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন
rtithi25@gmail.com

তুষার চিতা: অস্তিত্বের সংকট

সৈকত কুমার বসু: আজকের পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক প্রাণী ও গাছপালা। সব সময় আমরা তার খবরও হয়তো রেখে উঠতে পারিনা। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, আজ আমরা একটি প্রাণী বা গাছের আবিষ্কার ও তার বর্ণনা করার আগেই সেই প্রাণী অথবা গাছটি আমাদের পৃথিবীর বুক থেকে এত দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে যে আমরা তাদের হদিস রাখতে ব্যর্থ হচ্ছি। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

তুষার চিতা বা snow leopard এমনই একটি প্রাণী যা আমাদের রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। তুষার চিতার আবাস মূলত পামির মালভূমির অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে। রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ চীন, নেপাল ও ভুটানে হিমালয় পর্বতমালার মাঝে এখনো পর্যন্ত তুষার চিতার দুটি প্রজাতির কথা জানা যায়। একটি মধ্য এশিয়া, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত, আরেকটির অবস্থান হিন্দুকুশ, কারাকোরাম, হিমালয় পর্বতমালা অন্তর্ভুক্ত আফগানিস্তান, পাকিস্তান ভারত, চীন, নেপাল ও ভুটানে।

তুষার চিতা একটি অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় মার্জার গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী। সাধারণ চিতা বা চিতাবাঘের থেকে এর পার্থক্য রয়েছে। তুষার চিতা অত্যন্ত ঠান্ডা পাহাড়ি অঞ্চলের প্রাণী যা কিনা প্রায় মেরু অঞ্চলের মতোই বরফ ও পাথরের কঠিন আস্তরণে ঢাকা, যেমন পামির মালভূমি, হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের উচ্চ শিখর বিশিষ্ট অঞ্চল।

এই হিমশীতল পরিবেশে যেখানে অন্যান্য প্রাণীরা জীবন ধারণ করতে পারে না, সেই সমস্ত এলাকায় তুষার চিতারা অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। এরা মূলত পাহাড়ি ছাগল, হরিণ, ভেড়া এবং গবাদি পশুর মধ্যে চমরি গাই বা অন্যান্য গবাদি পশু শিকার করে। তুষার চিতারা অত্যন্ত রহস্যময় প্রাণী। এরা যৌন মিলনের প্রয়োজন ছাড়া কখনই একে অপরের কাছে আসেনা। পুরুষ চিতা সন্তান পালনের কোন দায়িত্ব পালন করেনা। মা তুষার চিতাই সন্তানদের সযত্নে লালন পালন করে, শিকার করা শেখায় এবং প্রায় তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত পালন করে। তুষার চিতারা দুই থেকে তিন বছর অন্তর এক থেকে দুটি চিতাশাবকের জন্ম দেয়।

এই বরফ কঠিন, হিমশীতল এবং অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে তুষার চিতার দেখা পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। তারা যে উচ্চ পর্বত শৃঙ্গের কাছাকাছি বসবাস করে সেখানে মানুষ তো দূরের কথা অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব।

তাও আজ বিশ্বব্যাপী তুষার চিতার সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত কমে আসছে, যা তাদের অস্তিত্বের সংকট ডেকে আনছে। এর একটি প্রধান কারণ হলো জলবায়ুর অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ফলে এদের প্রধান খাদ্য - পাহাড়ি ছাগল ও ভেড়া - যেমন হিমালয়ের থর, আইবেক্স ইত্যাদি প্রাণীরা গাছপালার সন্ধানে পাহাড়ের নিচে নেমে আসছে। এদের পিছনে ধাওয়া করে তুষার চিতাও নিম্নবর্তী অঞ্চলগুলি নেমে আসতে বাধ্য হচ্ছে খাদ্যের প্রয়োজনে। এরা বন্য পশুদের পাশাপাশি নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে গিয়ে গবাদি পশু শিকার করা শুরু করেছে। এর ফলে চিতা এবং মানুষের মধ্যে এক অনভিপ্রেত লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ি মেষপালকেরা বন্দুক, লাঠি, বল্লম, সড়কি, এমন কি বিষ প্রয়োগে এদের নির্বিচারে হত্যা করছে।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে অসাধু চোরাচালানকারী, চোরাশিকার এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীরা। তারা তাদের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নাইট ভিশন ক্যামেরায় (রাতে দেখার সুবিধা) দূরবর্তী লেন্সের সাহায্যে অতি সহজেই এদের শিকার করছে। তুষার চিতার চামড়ার দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কয়েক হাজার মার্কিন ডলার। অধিক লাভের আশায় দরিদ্র গ্রামবাসীরা এবং চোরা-শিকারিরা তুষার চিতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে। তাই আজ বিশ্বব্যাপী তুষার চিতা সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, এদের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে পাহাড়ি তৃণভোজী প্রাণীদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে; এর ফলে খাদ্যের অন্বেষণে এরা পাহাড় থেকে নেমে এসে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করছে।

IUCN-এর মতে সারাবিশ্বে বন্য তুষার চিতা সংখ্যা পাঁচ হাজারের নিচে নেমে এসেছে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ভারতেই একমাত্র তুষার চিতার কৃত্রিমভাবে বংশবৃদ্ধির কাজ চলছে। বিরাট সাফল্য না পেলেও এখনো পর্যন্ত প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি তুষার চিতা শাবকের জন্ম হয়েছে এবং শাবকদের স্বাবলম্বী হওয়ার পর প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর বেশিরভাগই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ না খাওয়াতে পেরে মারা গিয়েছে। বংশবৃদ্ধি কাজ মূলত সফল হয়নি। তাই আজ তুষার চিতা ভীষণরকম অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। নিষ্ঠুর অপরাধের শিকার হয়ে তুষার চিতা আজ বিপন্ন প্রাণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

কৃষিবিজ্ঞানী এবং
পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
saikat.basu@alumni.uleth.ca

কাশীর মানমন্দির

সৌমিত্র চৌধুরী :

প্রাচীন নগরী কাশী। ধমচর্চার পীঠস্থান বলেন অনেকে। সেখানে কি শুধু ধর্মচর্চাই হত? এমন তো হবার কথা নয়। মানুষ থাকবে। অট্টালিকা তৈরি হবে। ধর্ম, নীতিকথার সৃজন ঘটবে কিন্তু বিজ্ঞানচর্চা হবে না?

সত্যিই বিজ্ঞান অনুশীলন হত সেখানে। সঙ্গে চলত উন্নত মানের কারিগরি বিদ্যারচর্চা। এই বিষয়ে অনেক প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানের বহুবিধ বিষয় নিয়ে গবেষণা হত। জ্যোতির্বিজ্ঞানেরচর্চা চলত কাশী নগরীতে। আকাশচর্চার জন্য উন্নত মানমন্দির ছিল কাশীর গঙ্গাতীরে। এখনও টিকে আছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে পা রাখলেই চোখে পড়বে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রাচীনতম বিদ্যা। মহাকাশচর্চার শুরু মানুষের জন্ম লগ্ন থেকেই। আদিম মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে ভক্তিতে চাঁদ সূর্য গ্রহ তাঁরার দিকে চোখ মেলত। ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্মচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিল মহাকাশচর্চা।

কাশীর মানমন্দির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আকাশের নক্ষত্র, সূর্যের চলন, সময়ের হিসাব, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন নিখুঁত ভাবে গণনা করা হত কাশীর মানমন্দিরে। নামের সঙ্গে 'মন্দির' শব্দটি থাকলেও এটি কোনও পূজাস্থল নয়। মানমন্দির, যন্তরমন্তর, অবজারভেটরি অনেক নামেই তার পরিচয়। প্রায় চার'শ বছর আগে (১৭৩৭ সালে) তৈরি এই অবজারভেটরি। প্রতিষ্ঠাতা জয়পুরের (বা অম্বর রাজ্যের) রাজা মান সিংহ।

রাজা মান সিংহ ছিলেন আকাশবিজ্ঞান চর্চায় অতি উৎসাহী একজন শাসক। তাঁর সময়কালে ভারতবর্ষ ছিল মুঘল সম্রাটদের শাসনাধীন। বিভিন্ন কাজের সঠিক সময়, বা 'শুভমুহূর্ত' নির্ণয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। রাজা মান সিংহ উপলব্ধি করেছিলেন সঠিক সময় নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা। সেই কারণেই মনোনিবেশ করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুশীলনে। দেশ বিদেশে ছাত্র পাঠিয়েছেন মহাকাশচর্চা শিখে আসতে। আর 'মানমন্দির' কথাটির উৎপত্তি তাঁর নাম থেকেই।

রাজা মান সিংহ অনেক গুলো মানমন্দির তৈরি করেছিলেন দেশে, ১৭২৭ সাল থেকে ১৭৩৫ সাল সময়কালে। দিল্লী, মথুরা (তাঁর রাজত্বের অন্তর্গত), জয়পুর (তৎকালীন অম্বর রাজ্যের রাজধানী), উজ্জয়িনি (মালেয়ার রাজধানী) আর বেনারসে। কেন এতগুলো মানমন্দির? বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আকাশের গ্রহ তারা পর্যবেক্ষণ করে সময়ের নিখুঁত হিসাবে পৌঁছান। এই কাজের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ। দরকার হয়েছিল প্রচুর যন্ত্রপাতিও। ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ ও স্থাপতি বৃন্দের সহায়তায় তৈরি করিয়েছিলন বহুবিধ যন্ত্র। যন্ত্রগুলো বৃহৎ আকারের এবং স্থাপিত খোলা আকাশের নীচে।

কাশীর মানমন্দিরে এখনও টিকে আছে বহু যন্ত্র। যেমন নাড়ী বলয় যন্ত্র, চক্রযন্ত্র, দিগাংশ যন্ত্র ইত্যাদি। নাড়ী বলয় যন্ত্রটি নির্ভুল ভাবে গণনা করত আকাশে সূর্য ও অন্য নক্ষত্রের অবস্থান। উত্তর না দক্ষিণ গোলার্ধে কোথায় সেই নক্ষত্র দৃশ্যমান, তা-ও স্পষ্ট নির্ধারন করা যেত। যন্ত্রের বড় প্লেটের গায়ে অসংখ্য হিসেব বা অঙ্ক লেখা রয়েছে। এখনও খানিক চোখে পড়বে।

চক্রযন্ত্র, আরেকটি মূল্যবান আবিস্কার। এর সাহায্যে নির্ধারণ করা যেত সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার বিনতি বা Declination; মধ্য রেখা বা meridian থেকে তাদের দূরত্ব।

দিঘাংশ যন্ত্র দিয়ে নির্ধারিত হত অ্যাজিমুথ কোণ। অর্থাৎ গোলকের নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কত ডিগ্রী কোণে মহাকাশে বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থান। লক্ষ করুন, স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বা coordinate geometry বিষয়ে তাঁদের স্বচ্ছ ধারণা ছিল। নইলে এমন গণনা সম্ভবপর নয়।

সম্রাটযন্ত্র ব্যবহার হত সময় নির্ধারণের কাজে। চন্দ্রমাস, সৌরমাস ভিত্তিক ক্যালেন্ডার তৈরি করতে ব্যবহার হত যন্ত্রটি।

দক্ষিণোত্তর ভিত্তি যন্ত্র নির্ধারণ করতে পারত মাথার উপরে কত ডিগ্রী কোণে নির্দিষ্ট কোনও গ্রহ বা নক্ষত্রের সেই সময়ের অবস্থান।

চার'শ বছর আগেও মহাকাশ বিজ্ঞানের চর্চা চলত প্রাচীন কাশী নগরীতে। নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী ও গবেষক ছিলেন দেশ জুড়ে। হারিয়ে গেছে অনেক আবিষ্কার, বহু পুঁথি। নতুন প্রজন্ম উদ্ধার করবে হারিয়ে যাওয়া বহু সম্পদ, তেমনই আশা রাখি।

ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান ও
এমেরিটাস মেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট,
চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার
গবেষণা সংস্থা
soumitrag10@gmail.com

ইন্টারনেট রেডিও

তনুশ্রী দে: বর্তমানে বিশ্বে বিজ্ঞান প্রত্যহ অগ্রসর হয়ে চলেছে। নতুন নতুন অনেক কিছুই আবিষ্কার হচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাত ঘুমোতে যাওয়া প্রায় সবকিছুতেই বিজ্ঞানের ছোঁয়া। রেডিও, টিভি, মোবাইল ফোন সবকিছুই উন্নত হচ্ছে বিজ্ঞানের দৌলতে। বিজ্ঞানের পাশাপাশি ইন্টারনেট প্রযুক্তিও পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে শুরু হয়েছে ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন। কলকাতার বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ তৈরি করেছে একটি ইন্টারনেট রেডিও। নাম হল রেডিও কলকাতা। এই রেডিও শোনার জন্য প্রয়োজন ইন্টারনেট যুক্ত মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার। গুগল খুলে সার্চ অপশনে গিয়ে radiokolkata.org লিখে সার্চ করলে, রেডিও কলকাতার ওয়েবসাইট খুলে যাবে। সেখান থেকেই শোনা যাচ্ছে এই রেডিও'র সম্প্রচার প্রতিদিন রাত ৯ টায়। প্রথমে ভাবনাটা ছিল ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে। এই ভাবনাটা আরও বিস্তারিত হল। শুধু কলেজের গণ্ডি নয়, কলেজের বাইরের কমিউনিটির মানুষ, রাজ্যের মানুষ, দেশের মানুষ এমনকি বিশ্বের মানুষও উপকৃত হবেন এই রেডিও'র মাধ্যমে। নানান বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান চলছে এই রেডিওতে। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের চাষির কথা, চাষের কথা, বিশেষজ্ঞদের মুখে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষবাসের পরিকল্পনা নিয়ে অনুষ্ঠান চলছে 'চাষবাস' নামে। থাকছে স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান 'স্বাস্থ্যের সাথী' এবং বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান 'জিজ্ঞাসা'; নানান বিজ্ঞানের অজানা তথ্য, বিজ্ঞানীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান হয়। এই ইন্টারনেট রেডিও'র মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রী এবং নতুন প্রজন্মের সৃষ্টিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। শুধু নতুন প্রজন্ম নয়, পুরনো দিনের মানুষও যদি নতুন কিছু করতে চান, তার জন্য সুযোগ থাকছে এই ইন্টারনেট রেডিওতে। পুরনো নতুনের মেলবন্ধনে এক অভিনব সংস্কৃতিকে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে রেডিও কলকাতার সদস্যরা। বিজ্ঞান চেতনা সকল মানুষের মধ্যে জাগ্রত করতে এই ইন্টারনেট রেডিও ভূমিকা পালন করছে।

স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সায়েন্টুন

পটচিত্রে ভেষজ রঙের ব্যবহার

দীপাঞ্জন দে:

বাংলার পটচিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল প্রাকৃতিক উপাদান ও উপকরণের প্রয়োগে পট লেখা। হ্যাঁ, 'পট লেখা' কথাটি ব্যবহার করলাম তার কারণ হল পটুয়ারা আগে পটচিত্র আঁকা বলতে 'পট লেখা' কথাটিই ব্যবহার করতেন। আর এই পট লেখা হত ভেষজ রং দিয়ে। পটুয়ারা তাদের আশেপাশের প্রকৃতি থেকেই এই রং জোগাড় করতেন। পটশিল্প এভাবেই বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত চিত্রশিল্প হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেয়। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় পটুয়াদের বসতি এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

ঐতিহ্যমণ্ডিত পটচিত্রের অস্তিত্ব গ্রাম বাংলায় থাকলেও অঞ্চলবিশেষে এই পটচিত্রের নিজস্বতা চোখে পড়ে। আজও তারা প্রাকৃতিক উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রং তৈরি করে যা দেখাতে পারেন, তাই হল ভেষজ রং। নয়াতে ফিবছর যে পটমায়া উৎসব হয়, সেখানে পটুয়ারা ভেষজ উপাদান থেকে কীভাবে রং সংগ্রহ করা হয় এবং সেই রং দিয়ে কীভাবে পটচিত্র আঁকা হয় সেই পুরো প্রক্রিয়াটি দেখিয়ে দেন। বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে কয়েকটি পটুয়া ঘর রয়েছে, তারাও প্রাকৃতিক উপাদান থেকে রং সংগ্রহ করে পটচিত্র আঁকেন। তবে অঞ্চলভেদে এই ভেষজ রং ব্যবহারে তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক জায়গার পটুয়াদের অবশ্য নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি, "আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা ভেষজ রং ব্যবহার করে পটচিত্র আঁকতেন। এখন আমাদের পক্ষে আর ভেষজ রং ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।"

ভেষজ রং তৈরিতে পটুয়া পরিবারের মেয়েদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা ঘরোয়া পদ্ধতিতে এবং বিচিত্র সব প্রাকৃতিক সহজলভ্য উপাদান থেকে রং তৈরি করতে পারদর্শী ছিলেন। কাজটি খুব সহজ ছিল না। অঞ্চলভেদে প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের পটচিত্রের রঙে অনেক সময় পার্থক্য চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, মুর্শিদাবাদ জেলার পটচিত্রে ব্যবহৃত ভেষজ রংগুলির কথা বলা যেতে পারে।

যেমন: লাল রং : সিঁদুর, গিরিমাটি, জবাফুল ইত্যাদির সাথে বেলের আঠা মিশিয়ে লাল রং তৈরি করা হত। নীল রং : জামের রসের সাথে বেলের আঠা ও কাঠ কয়লার মিহি গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি করা হত কালচে নীল রং। সবুজ রং : শিম পাতার রস থেকে এবং নীল ও হলুদ মিশিয়ে সবুজ রং তৈরি হত। কালো রং : ধান সেদ্ধ হাঁড়ির ভুসা কালি ও লফের কালির সাথে বেলের আঠা মিশিয়ে কালো রং তৈরি করা হত। কমলা রং : লাল ও হলুদ রং মিশিয়ে কমলা রং তৈরি করা হত।

বর্তমানে মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা প্রধানত বাজার থেকে কেনা রং ব্যবহার করে পটচিত্র আঁকেন। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে রং তৈরি করে পট আঁকার প্রতি তাদের আর বিশেষ আগ্রহ নেই। ঐতিহ্য কি তাহলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

শিক্ষক
চাপড়া বাঙ্গালঝি
মহাবিদ্যালয়
নদীয়া
ddey3554@gmail.com

চলচ্চিত্রে পৃথিবী ধ্বংস

শুভেন্দু বিশ্বাস:

সালটা বোধ হয় ২০০৭ বা ২০০৮ হবে। চারিদিকে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে ২০১২ সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবী হয়ত ধ্বংস হয়নি কিন্তু কিভাবে ধ্বংস হতে পারে তা নিয়ে নির্মিত হয় হলিউড চলচ্চিত্র '২০১২'। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কিভাবে পৃথিবীর বিনাশ ঘটবে এই ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। আসলে মানুষ যতই আধুনিক হোক না কেন, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা কখনোই সম্ভব নয়। পরিবেশবিদরা বারবার পরিবেশের অবনমন নিয়ে সতর্কবাণী শুনিয়ে আসছেন। কিন্তু রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের কোনো হেলদোল নেই। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির বার্ষিক সম্মেলনে পরিবেশ দূষণ, আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ে নানা কর্মসূচি গৃহীত হলেও তা আদৌ রূপায়িত হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

যেভাবে পরিবেশ দূষণ বেড়ে চলেছে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে তার বিরূপ প্রভাব আমরা এখন থেকেই উপলব্ধি করতে পারছি। এর সাথে বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। বলতে গেলে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী একটু একটু করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে পৃথিবী কিভাবে ধ্বংস হতে পারে, তার সম্ভাব্য চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এই হলিউডি চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র মানেই যে শুধু বিনোদনের ক্ষেত্র এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবের প্রক্ষাপটে বিষয়টিকে বিচার করতে হবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সভ্যতার ধ্বংসের প্লট নির্ভর অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। বিগত ১৯৯৮ সালে মুক্তি পায় 'ডিপ ইমপ্যাক্ট' (Deep Impact) যেখানে দেখান হয়েছে একটি গ্রহাণু পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে চলেছে। তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব এবং তার থেকে পরিত্রাণের চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের মারাত্মক পরিণতি হিসেবে সমগ্র পৃথিবী বরফে ঢেকে যাওয়া এবং তা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা দেখানো হয়েছে 'দ্য ডে আফটার টুমরো' (The Day After Tomorrow - ২০০৪)-এ। একদিন হয়তো এমন সময় আসবে যখন প্রযুক্তির দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ণ্ত্রন করা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রকৃতি নিজের ইচ্ছে মত চলে, সেখানে মানুষের হস্ত ক্ষেপ হিতে বিপরীত হতে পারে। এই রকম একটি প্লট নিয়ে তৈরি হয়েছে 'জিওস্ট্রোম' (Geostrom) সিনেমা। এটি ২০১৭ সালে মুক্তি পায়। এখানে দেখানো হয়েছে জলবায়ু ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে জন্য যে স্যাটেলাইট নির্মিত হয়েছিল তাতে কিছু ত্রুটির জন্য পৃথিবীতে টর্নেডো, সুনামী, সাইক্লোন, বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ নেমে আসে। শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তিই পৃথিবীকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করে।

সুতরাং চলচ্চিত্র হল আমাদের সমাজ, সভ্যতার প্রতিচ্ছবি। ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত মানুষের কার্যকলাপ কিভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে পারে তার আভাস চলচ্চিত্রে পাওয়া যায়। বলতে গেলে ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতা কিভাবে ধ্বংস হতে পারে, তার সম্পর্কে সতর্কবার্তাই এইসব চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

শিক্ষক
পলাশী কলেজ
subhendub47@
gmail.com

বিজ্ঞান প্রচারেই বিজ্ঞান সম্প্রসারক মেলা

সাহনী সরকার :

কলকাতা: গত ২৯শে জুন সকাল ১০ টায়ই রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের মেঘনাথ সাহা হলে শুরু হল ১৩তম সায়েন্স কমিউনিকেটর মিট। বিষয়: বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান জ্ঞাপন। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানটির যুগ্ম উদ্যোক্তা ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (ইসনা) এবং ভারত সরকারের বিজ্ঞান প্রসার সংস্থা।

প্রারম্ভেই বক্তব্য রাখেন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক পথিক গুহ। সঞ্চালনায় ছিলেন ইসনার দুই সম্পাদক, ড. অমিত কৃষ্ণ দে এবং ড. মানস চক্রবর্তী। তাঁরা ইসনার ইতিহাস সম্পর্কে জানান সকলকে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কলকাতায় টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সহযোগী সম্পাদক শুভ্র নিয়োগী, অধ্যাপক বিকাশ কুমার চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক প্রবীর কুমার সাহা।

উদ্বোধনের পরে প্রথম পর্বে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, "বিজ্ঞান সম্প্রসারণকে নিয়ে কথা বললে প্রযুক্তিকে সঙ্গে রাখতেই হবে। একটা সময় দেখা যাবে বিজ্ঞান আগে আসবে, প্রযুক্তি আসবে পরে।" এরপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুধেন্দু মন্ডল, সায়েন্স এন্ড ক্যালচার ম্যাগাজিনের এডিটর-ইন-চিফ, এবং ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ড. চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বিজ্ঞান ক্লাব, পরিবেশ মেলা, বিজ্ঞান আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে অসামান্য তথ্য পরিবেশন করেন। শেষার্ধে অভিজিৎ বর্ধন বক্তব্য রাখেন "ওষুধের জন্য মানুষ না মানুষের জন্য "ওষুধ" এই বিষয়ে।

দ্বিতীয় পর্বের সঞ্চালনায় ছিলেন বিজ্ঞান কহন পত্রিকার সম্পাদক প্রশান্ত কুমার বসু। বক্তৃতা দেন বিখ্যাত সমাজবিদ্যা গবেষক কুমার রানা এবং অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক। তৃতীয় পর্যায়ে প্যানেল ডিসকাশন পর্বের সূচনা করেন ড. মানসপ্রতিম দাস। ফেক নিউজ নিয়ে বক্তব্য রাখেন নিউজ সেন্স সংস্থার সম্পাদক জয়দীপ দাশগুপ্ত এবং কমপিউটার বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক দেবপ্রসন্ন সিংহ।

অনুষ্ঠানটির অন্তিম পর্বের বক্তা ছিলেন বিজ্ঞান প্রসারের উপদেষ্টা সৌরভ সেন।

ছাত্র
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ
অ্যাসোসিয়েশন
sahonisarkar99@gmail.com

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল: মহামারী, সাম্রাজ্য ও পরিসংখ্যান

শুভঙ্কর দে:

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাওয়া একজন কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ সেবিকা হিসাবে যার সর্বাধিক পরিচিতি। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের শুশ্রুষা ও সেবা করার প্রতীক 'Lady with the lamp' হিসাবে যাকে নিয়ে অসংখ্য উপাখ্যান, প্রবন্ধ ও হাজার কিংবদন্তি রয়েছে।

মহান এই মানুষটিকে কি শুধু আমরা এই জন্যই মনে রাখবো? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের চলে যেতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। ইংল্যান্ড তখন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-১৮৫৬) নাস্তানাবুদ। দেখা গেল বন্দুক বোমা, গুলি, কিংবা কামানদাগায় মারা যাওয়া সৈন্যদের সংখ্যাটা বেশ কয়েক গুণে ছাপিয়ে গেছে কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ বিভিন্ন রোগ মহামারীজনিত মৃত্যুর কারণে। আর ঠিক এখানেই খোদ আসরে নামলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিসের হিসাব রাখা শুরু করলেন। যেমন ধরা যাক- সৈনিক হাসপাতাল গুলির অবস্থান, জানালার অবস্থান, আয়তন ও সংখ্যা, বিভিন্ন ওয়ার্ডে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার হিসাব, শৌচাগারের অবস্থানসহ একাধিক বিষয়। বিভিন্ন চার্ট, ডায়াগ্রাম, টেবিলের সাহায্য নিয়ে একজন খাঁটি পরিসংখ্যান-বিদের মত সেনাবাহিনীদের মধ্য ছড়িয়ে পড়া রোগের (প্রত্যেক দিন হিসাবে) পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, রোগের বিস্তারের গতি, প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নাইটিঙ্গেলের এই কাজ তারিফযোগ্য হয়ে ওঠে। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Notes on Hospitals'এ ফুটে ওঠে তৎকালীন ইংল্যান্ড ও ইউরোপের হাসপাতাল- গুলির দৈন্যও অন্তঃসারশূন্যতা।

নাইটিঙ্গলের রেকর্ড কিপিং ও পরিসংখ্যানতত্ত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিকিৎসক ও আধিকারিকগণ স্বাস্থ্য ও তৎসংক্রান্ত সংস্কার নীতির প্রশ্নে প্রায় নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হন। বলা যেতে পারে, কয়েক দশকের মধ্যেই চলে আসে এক নতুন বিপ্লব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের মাটিতে একবার পা না ফেলেও, নাইটিঙ্গেল (এবং তার মত অনেকেই) খুব সহজেই যেকোনো অঞ্চলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয় উপদেশ- পরামর্শ দিতে পারতেন, কারণ ততদিনে তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা তার নিজ প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের (উল্লেখ্য যা শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের মধ্যই সীমাবদ্ধ নয়) দুরূহ কর্মকাণ্ডটি সম্পাদন করে ফেলেছিল।

একজন সেবিকা হিসাবে তো বটেই, পরিসংখ্যানবিদ, এপিডেমোলজিস্ট, স্বাস্থ্যসংস্কারকরূপে কি তাহলে তিনি কম গুরূত্বপূর্ণ?

সহকারী অধ্যাপক,
ইতিহাস বিভাগ,
সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়
suvankar.dey17@gmail.com

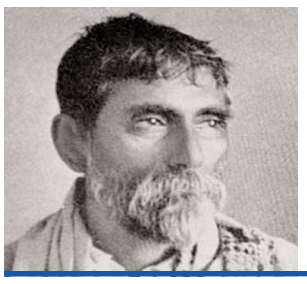

বিজ্ঞান কথন

কলকাতা/ নভেম্বর ১০, ২০২২, বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

কবিগুরুর বিজ্ঞানপ্রেম

শ্রেয়ান সেন:

রবীন্দ্রনাথ প্রাণবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে লিখেছিলেন

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-
মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি
বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে'।

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে বিশেষজ্ঞরাই বিজ্ঞানী নামে পরিচিত। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে দূরত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ সাহিত্য একটা কল্পনার বিষয়-বস্তু, যুক্তিসিদ্ধ মননের প্রকাশ। অপরটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণার মাধ্যমে স্বতঃসত্য আবিষ্কার করে মানবকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। মানুষের সামাজিক শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধিতে, শিক্ষা-নীতিতে, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার কথা বলা হয়েছে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান, গল্প, কবিতা, উপন্যাস তথা লেখনির মাধ্যমে তাকে সমাজ-বিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানী বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই সমাজ থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে গেলে সমাজের ব্যক্তি-মানস রবীন্দ্রনাথের পরশ পাওয়া যায়। যে মানুষের কল্পনায় বিপুল সত্য ও সৌন্দর্যের উদ্বোধন এবং সহজ-সরল ভাষায় মত প্রকাশ করাই হচ্ছে রবীন্দ্র চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

মাত্র সাড়ে বারো বছর বয়সে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি অস্বাক্ষরিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন; শিরোনাম 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। এটি কিন্তু এখন স্বীকৃত যে, গ্রহগণ জীবের আবাসভূমিই রাবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দু' জায়গায় সেই কিশোর বয়সে লেখা রচনাটির উল্লেখ করেছিলেন। এই লেখার অনেক অনেক বছর পার করে শেষ বয়সে এসে কবিগুরু ১১৫ পৃষ্ঠার আরেকটি বিজ্ঞানভিত্তিক বই লিখলেন, নাম 'বিশ্বপরিচয়'। শুধু তাই নয়, তিনি বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক সময়কার কৃতি শিক্ষক, উপমহাদেশের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসুকে।

বিস্ময়ের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতি ধর্মবোধ আর উপনিষদীয় জীবনদৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও সেখানে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি কোন বিরূপতা ছিল না, তা আমরা জীবনস্মৃতিতে যথেষ্টই লক্ষ্য করি। এই বিজ্ঞানশিক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বৈজ্ঞানিক করার জন্য নয়। কিন্তু স্বয়ং তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কথা বুঝেছিলেন যে,

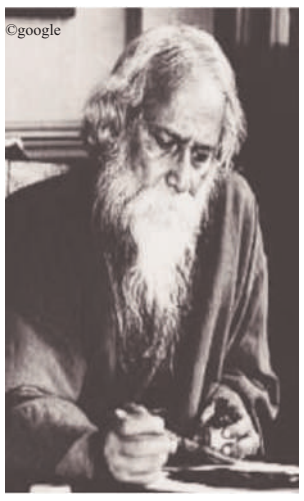

বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও গতিশীলতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাই থাকুক না কেন, তার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে এবং রবীন্দ্রনাথের মতো বালকের তা জানা দরকার। তাই তিনি ছোট ছেলেকে হিমালয়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে প্রোক্টরের জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ থেকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি চিনিয়ে দিতেন।

আইনস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় ১৯২৬ সালে, কবিগুরুর দ্বিতীয়বার জার্মানি ভ্রমণের সময়। এই প্রথম সাক্ষাৎকারের অবশ্য কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এটি নিশ্চিত যে, রবিঠাকুরের সান্নিধ্য আইনস্টাইনের মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধের জন্ম দিয়েছিলো এবং সেইজন্যই আইনস্টাইন ও কবিগুরুর মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান হত।

বিশ্বকবি বলেন, 'যখন আমাদের মহাবিশ্ব মানুষের সাথে ঐকতানে বিরাজ করে তখন শাশ্বত, যাকে আমরা সত্য বলে জানি, হয়ে দাঁড়ায় সৌন্দর্য, আমাদের অনুভূতিতে। এছাড়া অন্যকোন ধারণা থাকতে পারে না। এই জগৎ বস্তুত মানবীয় জগৎ- এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও হল বিজ্ঞানী মানুষের দৃষ্টি। সুতরাং, আমাদের ছাড়া বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব নেই; এটি হল আপেক্ষিক জগৎ, যার বাস্তবতা আমাদের চেতনার ওপর নির্ভরশীল।'

পরিশেষে বলা যায় যে, তার বিজ্ঞানশিক্ষা বা বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস যাই হোক, এক অভাবিত বিজ্ঞানবোধ তাঁর মনন ও কল্পনা উভয়কেই আচ্ছন্ন করেছিল। তার একটি উপাদান হলো এই বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তার ধারণা। খুব অল্পবয়সেই এই অস্তিত্বের বিশাল পরিসর সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বুঝে উদ্ভাসিত হয়ে 'আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ' সম্বন্ধে তার একটি বোধ তৈরি হয়েছিল। এই বোধ তার কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে, কারণ এর উৎস বিজ্ঞান হলেও এর মধ্যে জন্ম দিয়েছে এমন এক বিস্ময়, যা তাকে দিয়ে বলিয়েছে, 'বিস্ময়ে তাই জাগে আমার হৃদয়ে মানবের জয় বিজ্ঞানের জয় জয়কার'।

বিএস.সি. (প্রাণিবিদ্যা)
চারুচন্দ্র কলেজ
shreyaansen2001@gmail.com

নোবেল মাস: এক অশ্রুত বিজ্ঞানীর বিস্মৃত আবিষ্কার

প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়:

অক্টোবর মাস প্রতিবছরই গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর অন্যতম প্রধান কারণ নোবেল পুরস্কার প্রদানের সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও তাদের গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হয় তামাম দুনিয়া। এ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

অতিমারীর আবহে গতবছরই এই অক্টোবর মাসে দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল এক বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম। তিনি হয়তো নোবেল পাননি। তবে পুরুলিয়ার বাঙালি বিজ্ঞানী শ্যামসুন্দর নন্দী ও তাঁর সঙ্গীরা যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িয়ে রইলেন তা পেশাগত রোগের ইতিহাসে এক পথ-প্রদর্শনকারী উদ্ভাবন যা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের মুখে একটু হলেও হাসি ফোটাতে পারে।

কি এই পেশাগত রোগ? খুব সাধারণ ভাবে বলা যায় পেশাগত রোগ যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি যা কাজ বা পেশাগত কার্যকলাপের ফলে ঘটে। এটি পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই পেশাগত রোগের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যাধি হল সিলিকোসিস। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অকুপেশনাল হেলথ (এনআইওএইচ)-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে সমগ্র ভারতে প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ মানুষ সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত।

খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কেন হয় এই রোগ? গবেষক ও চিকিৎসকরা বলছেন, মূলত পাথরভাঙা কল, কাঁচের জিনিসপত্র তৈরির কারখানা, কয়লা খনিসহ বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকরাই মূলত সিলিকোসিস রোগের শিকার। এই কাজগুলিতে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকার ফলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সিলিকা ফুসফুসে জমে এই রোগ হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শ্রমিকদের শ্বাস টেনে নেওয়ার সময় বায়ুর সঙ্গে সিলিকা ধূলিকণা ফুসফুসের অভ্যন্তরে বায়ুকোষীয় থলির মধ্যে জমা হয় এবং আঁকড়ে থাকে। এগুলি ফুসফুস থেকে নির্গত দূষিত বায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলে ফুসফুস ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা দেখা দেয়, ওজন কমতে থাকে, গায়ের রং কালচে হতে থাকে। বুকে যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট, ও শারীরিক দুর্বলতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। জল ভরা বালতি টেনে ওঠাতে না পারা বা কুয়ো থেকে জল তুলতে না পারা, টিউবওয়েল পাম্প করতে না পারা, একটানা এক বা দুই কিলোমিটার হাঁটতে না পারা, যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণের শিকার হওয়া এবং চিকিৎসায় যক্ষ্মা রোগের নিরাময় হলেও শ্বাসকষ্ট ও বুকে যন্ত্রণা ক্রমাগত বাড়তে থাকা - এই সব উপসর্গগুলি আগের তুলনায় খারাপ হওয়ায় বোঝা যায় যে রোগী ক্রমাগত বাড়তে থাকা পেশাগত ও দুরারোগ্য সিলিকোসিস ব্যাধিতে আক্রান্ত। যার চূড়ান্ত পরিণতি রোগীর মৃত্যু।

ঠিক এই প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানী শ্যামসুন্দর নন্দী ও তাঁর সঙ্গীদের গবেষণা আলাদা গুরুত্বের দাবি রাখে। কী তাঁদের উদ্ভাবন? ডাক্তারি পরিভাষায় তাঁদের এই আবিষ্কারটি হল 'কিট', যার সাহায্যে উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগেই রক্ত পরীক্ষায় ধরা দেবে এই মারণ ব্যাধি - সিলিকোসিস। বিগত কয়েক দশকে আমাদের দেশের নানাপ্রান্তে এই ধরনের পেশাগত রোগের কথা আলোচনার শিরোনাম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য নাগরিক মঞ্চ ও চিচুরগেড়িয়া আন্দোলনের প্রধান কাণ্ডারী সমাজকর্মী বিজন ষড়ঙ্গীর (১৯৬৩-২০০৯) লড়াইয়ের কথা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও সরকার এত নীরব কেন? ভুললে চলবে না, শ্রমিকদের সুস্থ জীবনের লক্ষ্যে সুস্থ কর্মপরিবেশ পেশাগত রোগের বিষয়টিও শ্রমিক আন্দোলনের রূপরেখায় তুলে ধরাটা জরুরি।

সহকারী অধ্যাপক
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
pmukherjee.ju2@gmail.com

চাঁদে জল

দেবব্রত সুর:

গ্রহ বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে যারা সৌরজগতের উপর গবেষণা করছেন, তারা চাঁদে কোন আকারে জলের উপস্থিতি আছে কিনা তা জানতে খুব আগ্রহী। এখানেই এজন্য কিছু ভাল খবর আছে। চাঁদের মেরুতে অনেক স্থায়ীভাবে ছায়াযুক্ত অঞ্চল বা ক্রেটার রয়েছে যেখানে চাঁদের কক্ষপথের জ্যামিতির কারণে সূর্যের রশ্মি একেবারেই পৌঁছায় না। তারা স্থায়ী অন্ধকারে। ভিতরের তাপমাত্রা -১৭০ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যেতে পারে রাতের বেলায়। বৃহত্তম পরিমাপ দশ কিলোমিটার জুড়ে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে শ্যাকলটন ক্রেটার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের চেয়ে দ্বিগুণ গভীর। বিগত ৯ অক্টোবর, ২০০৯-য়ে একটি দু' টন ওজনের রকেট ইচ্ছাকৃতভাবে জেট-ব্ল্যাক ক্যাবিউস ক্রেটারে ৯০০০ কিলোমিটার/ঘন্টা বেগে পাঠানো হয়েছিল। তার ফলে গর্তটি উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ধুলোর ঝরনা বেরিয়ে এসেছিল কয়েক হাজার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত আলোয় ভরা গর্তটি থেকে। দুর্ঘটনাটি নাসার লুনার ক্রেটার অবজারভেশন অ্যান্ড সেন্সিং স্যাটেলাইট (এলসিআরওএ-সএস) মিশন দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছিল। রকেটের পিছনে থাকা আরেকটি মহাকাশযান এটির নমুনা নেওয়ার জন্য ধুলোর ভিতর দিয়ে উড়েছিল। এর ফলে বিজ্ঞানীরা ১৫৫ কেজি জলীয় বাষ্প ধূলিকণার মধ্যে শনাক্ত করেছেন। প্রথমবারের মতো চাঁদে জল পাওয়া গেছে।

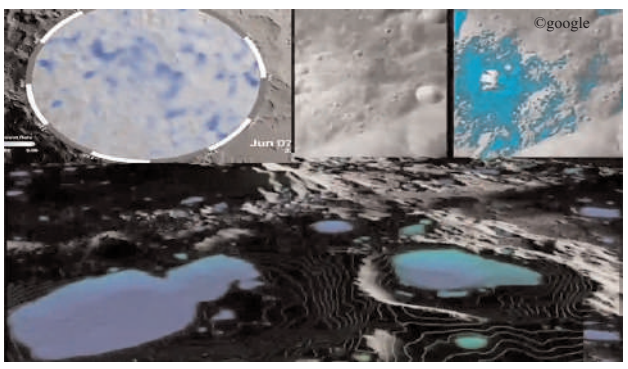

বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন চাঁদে ৬ ট্রিলিয়ন কেজি জলের বরফ রয়েছে। কিছু দ্বৈত-ছায়াযুক্ত অঞ্চল এখনও রয়েছে যেগুলি আরও বিদেশী বরফ, এমনকি কার্বন ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন যদি থাকে তাকে হিমায়িত করার জন্য যথেষ্ট ঠান্ডা। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এই বরফের রাসায়নিক সংমিশ্রণ থেকে জানা যাবে কীভাবে জল চাঁদে পৌঁছেছে।

২০২৫ সালের শেষ নাগাদ, নাসা একটি গল্ফ-কার্ট সাইজ রোভার পাঠাবে, VIPER নামক চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে আরও বেশি গর্ত অন্বেষণ করতে। এটি মাটিতে ড্রিল করবে। এটি বরফের বিশ্লেষণ করতে স্পেকট্রো-মিটার ব্যবহার করবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, নাসা আশা করে যে মহাকাশচারীরা এটিকে পানীয় জল হিসাবে বা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন, অবশ্য বরফের জলে যদি ডয়টেরিয়াম পাওয়া যায়।

পলিমার
বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ
sur_debu@hotmail.com

নিবন্ধ পাঠানোর ই-মেল

bigyankahon@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক: শ্রী প্রশান্ত কুমার বসু
যুগ্ম সম্পাদক: ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক: সুকল্যাণ গাইন

সদস্য: শ্রী পথিক গুহ, ড. নকুল পরাশর, ড . কে মুরলিধরন, ড. সুধেন্দু মণ্ডল, ড. মানস চক্রবর্তী, ড. বরুণ চ্যাটার্জি, ড. শ্যামল চক্রবর্তী, ড. অমিত কৃষ্ণ দে, ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ড. মানসপ্রতিম দাস, ড. শঙ্করাশিস মুখোপাধ্যায়, ড. সুমিত্রা চৌধুরী, ড. সীমা মুখোপাধ্যায়, শ্রী দেবপ্রসন্ন সিংহ, ড. মীনাক্ষী দে, ড. বুড়োশিব দাশগুপ্ত, ড. কালিপ্রসন্ন ধাড়া, ড. আশিস দাস, শ্রীমতী অর্পিতা চক্রবর্তী, শ্রী রাতুল দত্ত ও বকুল শ্রীমানী

সম্পাদনা-সহকারী
বর্ণীনি ভট্টাচার্য, তুহিন সাজ্জাদ সেখ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী দে, নিপা ব্যানার্জী, সেখ জিন্নাত আলি, অনির্বাণ দে, সৈকত কুমার বসু, জুনেদ জিব্রান জাভেদ, রিজওয়ানা পারভীন, শেফালিকা ঘোষ সমাদ্দার, কৃষ্ণেন্দু রথ

কারিগরি উপদেষ্টা: শিব শঙ্কর দত্ত

৩৫ তম ট্রেনিং পোগ্রাম অন সায়েন্স কমিনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস,
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন,
৯২, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ -এর পক্ষে
ড. অমিত কৃষ্ণ দে ও ড. টি ভি ভেঙ্কটশরণ কর্তৃক প্রকাশিত
ই-মেল- isnatraining@gmail.com
website: www.scienceandculture-isna.org

© ISNA: Articles may be reproduced with due acknowledgement to ISNA